

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ
থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণী

রচনা

বিপ্রদাশ বড়ুয়া
জীবনানন্দ বড়ুয়া

সম্পাদনা

সুব্রত বড়ুয়া

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : জানুয়ারি, ১৯৯৬
সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০০
পরিমার্জিত সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০০৮
পুনর্মুদ্রণ :

কম্পিউটার কম্পোজ
ফাইন ডট লিঃ

প্রচ্ছদ
মোঃ পারভেজ

চিত্রাঙ্কন
শওকাতুলজ্জামান
নজরুল ইসলাম দুলাল

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

মুদ্রণ :

প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষার উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারায় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ যাতে পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয় নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন পাঠ্যপুস্তক। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রচলিত ছিল।

উন্নয়নের ধারায় ১৯৯৪ সালে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সংস্কার, পরিমার্জন ও বাস্তবায়নের জন্য “শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স” গঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সময়ের সাথে সাথে দেশ ও সমাজের চাহিদা পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ২০০০ সালে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। ২০০৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত শিক্ষা বিষয়ক টাস্কফোর্সের সুপারিশে প্রচ্ছদ প্রণয়ন, বানান ও তথ্যগত বিষয় সংশোধনসহ পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় করা হয়েছে। আশা করা যায়, পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নিকট আরো গ্রহণযোগ্য ও সময়োপযোগী বলে বিবেচিত হবে।

শিক্ষাক্রমের আলোকে মূল্যায়নকে আরো ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের সুধীজন ও শিক্ষাবিদগণের পরামর্শের প্রেক্ষিতে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায়শেষে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। প্রত্যাশা করা যায়, এতে শিক্ষার্থীর মুখস্থনির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে বা যে কোনো বিষয়কে বিচার-বিশ্লেষণ অথবা মূল্যায়ন করতে পারবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত নীতিমালা অনুসরণে ষষ্ঠ শ্রেণীর বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকটি লেখা হয়েছে। এ পুস্তকে বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য ও শিখনফলের সার্বিক প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের পঠন-পাঠনে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিষয়বস্তুভিত্তিক চিত্র সন্নিবেশ করা হয়েছে। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সদাচরণ, সর্বজীবে দয়া, সংযম ও শৃঙ্খলা প্রভৃতি বুদ্ধের উপদেশ অনুসরণে শিক্ষার্থী নৈতিক জীবনের উৎকর্ষ সাধনে উদ্যোগী হবে।

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার নিরন্তর প্রচেষ্টার সঙ্গী হিসেবে শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠু বিকাশে বর্তমান সংস্করণে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও চেতনা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরো সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যাঁরা এই পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। যাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হল, আশা করি তারা উপকৃত হবে।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম	গৌতম বুদ্ধ ও জীবপ্রেম	১
দ্বিতীয়	বন্দনা	৯
তৃতীয়	শীল	১৩
চতুর্থ	সূত্র ও নীতিগাথা	১৯
পঞ্চম	চতুরার্যসত্য	২৫
ষষ্ঠ	ধর্মীয় অনুষ্ঠান	২৮
সপ্তম	চার মহাতীর্থ	৩৪
অষ্টম	চরিতমালা	৩৯
নবম	জাতক	৪৮
দশম	প্রথম বৌদ্ধ মহাসংগীতি	৫৯
একাদশ	বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম	৬৩

প্রথম অধ্যায়

গৌতম বুদ্ধ ও জীবপ্রেম

জন্ম ও গৃহত্যাগ

আজ থেকে অনেক অনেক বছর আগে খ্রিস্টপূর্ব ৬২৩ অব্দে কুমার সিদ্ধার্থের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম শুম্ভোদন। তিনি শাক্যদের রাজা ছিলেন। সিদ্ধার্থের মায়ের নাম মহামায়া। মহামায়ার পিত্রালয়ে দেবদহনগরে যাওয়ার পথে লুম্বিনী কাননে সিদ্ধার্থ ভূমিষ্ঠ হন।

সিদ্ধার্থের জন্মের সাত দিন পর মহামায়ার মৃত্যু হয়। তারপর সিদ্ধার্থের লালনপালনের ভার নেন রাজা শুম্ভোদনের অপর এক পত্নী মহাপ্রজাপতি গৌতমী। তিনি মহামায়ার বোন ছিলেন। রানী গৌতমীর প্রতিপালিত বলে সিদ্ধার্থের আরেক নাম গৌতম। এছাড়া শাক্যবংশে জন্ম বলে তিনি শাক্যসিংহ নামেও পরিচিত ছিলেন।

জন্মের পর রাজজ্যোতিষীরা গৌতমের জন্মপঞ্জিকা তৈরি করেন। পণ্ডিতরা তাঁর মধ্যে মহাপুরুষের বত্রিশটি সূক্ষ্ম দেখতে পান। তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করেন, কুমার হয় রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ চক্রবর্তীরাজা হবেন অথবা পূর্ণজ্ঞানী হবেন। বুদ্ধ হয়ে জগৎজোড়া খ্যাতি লাভ করবেন।

সেই থেকে রাজা শুম্ভোদনের সব সময় ভয়, পাছে গৌতম সন্ন্যাসী হয়ে যান। তাই অল্প বয়স থেকে কুমারকে সব রকম আনন্দের মধ্যে রাখার ব্যবস্থা করেন। আনন্দ দিয়ে, হাসি দিয়ে চরম সুখের মধ্যে তাঁকে আগলে রাখতে লাগলেন। শিক্ষা দিলেন রাজপুত্রের জন্য প্রয়োজনীয় সবরকম বিদ্যা। লেখাপড়া ও অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী করে তুলতে শুরু করলেন। গৌতম যেন দুঃখের পরশ না পান, শোক কি তা না বুঝতে পারেন সেইভাবে সকল ব্যবস্থা করেন।

দিনে দিনে সিদ্ধার্থ বড় হতে লাগলেন। কিন্তু পিতা শুম্ভোদন কিছুতেই স্বস্তি পান না। বার বার তাঁর মনে পড়ে যায় পুত্র সম্পর্কে জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা। শুম্ভোদন তখন মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তাঁরা পরামর্শ দিলেন, কুমারকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা হোক। বিবাহের আগে গৌতমকে সকালে প্রচলিত ক্ষত্রিয়দের মতো বিদ্যাশিক্ষা ও যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কে পরীক্ষা দিতে হয়। একে একে সবরকম পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হলেন। তারপর মামাতো বোন দেবদহ রাজার কন্যা গোপাদেবীকে বিবাহ করেন। রাজা শুম্ভোদনও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। কিন্তু কুমার গৌতমের মনে শান্তি নেই। তিনি নিজেকে প্রশ্ন করেন, কেন মনে শান্তি নেই? শান্তি কোথায়? তাঁর বয়স তখন ঊনত্রিশ বছর। এ সময় তাঁর জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে।

একদিন তিনি উদ্যান ভ্রমণে বের হলেন। প্রথমে পূর্ব দিকে। প্রিয় সারথী ‘হন্দক’ রথ সাজিয়ে আনলেন। রাজা শুম্ভোদন আদেশ দিলেন, রাজকুমার উদ্যান ভ্রমণে যাচ্ছেন। উদ্যান ভ্রমণের সময় কুমারের চোখে জরাগ্রস্ত, ব্যাধিগ্রস্ত, মৃত ও সন্ন্যাসী যেন না পড়ে। আনন্দ উৎসবে উদ্যান ভরে থাকুক।

গৌতমেরও মনে হল জগতে দুঃখ নেই, কান্না নেই, হতাশা নেই। এ সময় হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল এক বৃদ্ধ। গৌতম সারথীকে জিজ্ঞাসা করলেন, ও কে, হন্দক?

হন্দক বললেন, এক বৃদ্ধ।

গৌতম বললেন, সকলেই কি বৃদ্ধ হবে? আমরাও হবে?

হন্দক বললেন, হ্যাঁ, আমাদেরও একদিন বৃদ্ধের মতো অবস্থা হবে।

অমনি গৌতম বললেন, হন্দক, রথ ফিরাও। আমি আর নগর ভ্রমণে যাব না।

আর একদিন গৌতম বের হলেন দক্ষিণ দ্বার দিয়ে। সঙ্গে সারথী হন্দক। চারদিকে আনন্দ উৎসব চলছে। রথ চলল এগিয়ে। এমন সময় গৌতম একজন অসুস্থ লোককে দেখতে পেলেন। অসুখে কাতর। ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে লোকটি।

গৌতম রথ থামাতে বলে ছন্দককে বললেন, ওই লোকটি কে? সে এত কষ্ট পাচ্ছে কেন?

ছন্দক বললেন, লোকটি অসুস্থ। রোগে কষ্ট পাচ্ছে।

গৌতম বললেন, আমিও কি রোগে কষ্ট পাব?

গোপাদেবীরও এ অবস্থা হবে?

ছন্দক বললেন, জীবমাত্রই রোগে আক্রান্ত হয়।

গৌতম সেদিন আর উদ্যান ভ্রমণে গেলেন না।

তৃতীয় দিন পশ্চিম দিকে উদ্যান ভ্রমণে গিয়ে সিদ্ধার্থ দেখলেন, চারজন লোক একটি মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে যাচ্ছে। তার পিছনে কতকগুলো মানুষ কাঁদতে কাঁদতে চলেছে। গৌতম ছন্দককে বললেন, কে ওই লোকটা, কেনই বা লোকগুলো কাঁদছে? ছন্দক সব বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি মৃত্যু। কোনো জীবই মৃত্যুকে এড়াতে পারে না। গৌতম এবারও ফিরে এলেন।

আর একদিন বের হলেন উত্তর দিকে। এবার দেখলেন গৃহত্যাগী এক তরুণ সন্ন্যাসীকে। গৌতম ছন্দককে জিজ্ঞাসা করলেন, ইনি কে?

ছন্দক বললেন, তিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। তিনি মা বাবা, আত্মীয়স্বজন সকলকে ত্যাগ করেছেন।

গৌতমের মনে হল ওই সন্ন্যাসী কত সুখী। আর তাঁর মধ্যে দেখতে পেলেন নিজের জীবনের ছবি। সজ্ঞে সজ্ঞে তিনি যেন জেগে উঠলেন। তারপর ছন্দককে বললেন, রথ ঘোরাও। তিনি ভাবলেন, জন্ম নিলেই রোগ হবে, জরা আসবে, মৃত্যু বরণ করতে হবে। আমাকে এসব থেকে মুক্তি পেতেই হবে। কিন্তু সংসারে অবস্থান করে এসব থেকে মুক্তি অসম্ভব। সংসারের বন্ধন তাঁকে ছিন্ন করতেই হবে।

রাজবাড়িতে ফিরে এলেন গৌতম। এদিকে পুত্র রাহুলের জন্ম হলো। নবজাতক রাহুলের কথা ভাবলেন তিনি। তাঁর মনে হলো, রাহু যেমন চাঁদকে গ্রাস করে তেমনি পুত্র রাহুলও তাঁকে সংসারের বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য এসেছে। তখন তিনি সংকল্প করলেন— গৃহত্যাগ করবেন।

সেদিন আষাঢ়ী পূর্ণিমা। রাজবাড়িতে সবাই ঘুমিয়ে আছে। গৌতম তখন উঠে পড়লেন। ছন্দককে বললেন, আমার ঘোড়া আন। আমি সন্ন্যাসে যাব। ছন্দক আদেশ পালন করলেন। অশ্ব কন্ঠককে সাজিয়ে আনলেন। বিদায়ের আগে গৌতম গোপাদেবীকে শেষ বিদায় জানাতে গেলেন। দেখলেন, পুত্র রাহুলকে বাহুতে রেখে তিনি পরম সুখে ঘুমিয়ে আছেন। গৌতম গোপাদেবীকে আর জাগালেন না। এক পলক দেখে রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। পিছনে পড়ে রইলো দুঃখের সংসার। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। চলতে চলতে দেখলেন সামনে ছোট নদী অনোমা বয়ে চলেছে। অনোমা নদী পার হয়ে গৌতম থামলেন।

গৌতম বললেন, ছন্দক এবার এখান থেকে তুমি ফিরে যাও। ছন্দক গৌতমকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাঁর মন বিষণ্ণ হয়ে উঠল কষ্টে। গৌতমের প্রিয় অশ্ব কন্ঠক শোকাহত হয়ে সেখানেই মৃত্যুবরণ করল। শূন্য বুকে ছন্দক ফিরে চললেন কপিলবাস্তুর দিকে।

বুদ্ধত্বলাভ

গৌতম পায়ে হেঁটে পৌঁছলেন বৈশালী নগরে। ঋষি আরাড় কালাম, রামপুত্র রুদ্রকের কাছে ধ্যান, যোগ ইত্যাদি শিক্ষা গ্রহণ করলেন। তাতে মন ভরল না। সেখান থেকে তিনি গেলেন রাজগৃহে। রাজা বিম্বিসার তাঁকে রাজ্যাংশ দিতে চাইলেন। কিন্তু তিনি গ্রহণ করলেন না। আবার তিনি চললেন। দুঃখের শেষ কোথায় জানতে হবে। সজ্ঞে তাঁর পাঁচ শিষ্য কৌণ্ডিন্য, বম্প, ভদ্রিয়, মহানাম ও অশ্বজিৎ। পথ ঝুঁজতে ঝুঁজতে অবশেষে উরুবেলার সেনানী গ্রামে পৌঁছলেন। সেখানে দেখলেন একটি সুন্দর বন। পাশে নদী। এর নাম নৈরঞ্জনা। নদীর ধারে বিরাট এক অশ্বখ গাছ। ধ্যান-সাধনার জন্য এই তো মনোরম স্থান।

এই অশ্বথ বৃক্ষের নিচে তিনি কঠোর তপস্যা শুরু করলেন। দেখতে দেখতে প্রায় ছয় বছর কেটে গেল। শরীর জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেল। হাঁটতে পারেন না। বসলে উঠতে পারেন না। তখন তিনি মনস্থির করলেন, এভাবে কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ হবে না। মধ্যম পথ বেছে নিতে হবে। শরীর দুর্বল হলে মনও দুর্বল হয়ে পড়বে। দুর্বল মন সাধনার পথে বাধা সৃষ্টি করে। এরপর আহার করে আবার ধ্যান শুরু করলেন। তাঁর পাঁচ শিষ্য দেখলেন গৌতম আহারও করেন, ধ্যানও করেন। তাঁরা গৌতমের কঠোর সাধনা ত্যাগ করা দেখে তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন।

শিষ্যরা চলে গেলে স্থানটি আরও নির্জন হয়ে গেল। এ সময় একদিন সুজাতা নামে এক তরুণী তাঁকে উত্তম পায়ের দান করেন। সেই পায়ের গ্রহণ করে বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে তিনি নতুন উদ্যমে ধ্যান শুরু করলেন। সেদিন তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, হয় তিনি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করবেন অথবা মৃত্যুবরণ করবেন। জ্ঞানলাভ ছাড়া কিছুতেই তিনি ধ্যানের আসন ত্যাগ করবেন না।

বৈশাখী পূর্ণিমার চাঁদ তখন আকাশে। অশ্বথ গাছের নিচে বসে ধ্যান করে প্রথমে মারকে জয় করলেন। মার হল অশুভ শক্তির দেবতা। তাকে পরাজিত করে রাতের প্রথম প্রহরে তিনি তাঁর পূর্বজন্মসমূহের সব বিষয় অবগত হলেন। অর্থাৎ তিনি জাতিস্মরণ জ্ঞান লাভ করলেন। রাতের দ্বিতীয় প্রহরে লাভ করলেন দিব্যচক্ষু। তৃতীয় প্রহরে জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর রহস্য আবিষ্কার করলেন। তিনি হলেন জগতের আলো বুদ্ধ।



নৈরঞ্জনা নদীর তীরে সিদ্ধার্থ



বুদ্ধের পঞ্চবর্গীয় শিষ্য

যে অশ্বথ গাছের নিচে বসে তিনি জ্ঞানলাভ করলেন সে গাছের নাম হল ‘বোধিদ্রুম’ বা ‘বোধিবৃক্ষ’।

জ্ঞানলাভের পর তাঁর নাম হয় ‘বুদ্ধ’ অর্থাৎ জ্ঞানী। যে স্থানে তিনি জ্ঞানলাভ করলেন তার নাম হল বুদ্ধগয়া। সেই বোধিবৃক্ষের গা ঘেঁষে আছে বুদ্ধগয়ার ভুবনবিখ্যাত মন্দির। সারা পৃথিবীর বৌদ্ধদের কাছে এই স্থানটি আজও সবচেয়ে পবিত্র। সেই সুন্দর স্থানটির সৌন্দর্য এখনও অম্লান আছে।

বুদ্ধত্ব লাভের পর থেকে গৌতমের বোধিসত্ত্ব জীবনের সমাপ্তি হল। তিনি লাভ করলেন নির্বাণ মার্গের জ্ঞান। যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তিনি অমর হয়েছেন তার নাম হল ‘চারি আর্যসত্য’ এবং তার অন্তর্গত ‘আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ’। এভাবে তিনি হলেন বুদ্ধ।

ধর্ম প্রচার

বুদ্ধত্ব লাভ করে তিনি আষাঢ়ী পূর্ণিমায় পৌঁছলেন সারনাথে। সেখানে ছিলেন তাঁর সেই পাঁচজন শিষ্য যারা তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তাঁরা বুদ্ধকে দেখে প্রথমে প্রণাম করতে চাননি। পরে তাঁরা বুদ্ধের শরীর ঘিরে দিব্যজ্যোতি দেখে তাঁদের ভুল বুঝতে পারলেন। তিনি তাঁদের কাছে সর্বপ্রথম তাঁর নতুন ধর্ম প্রচার করলেন। তাঁরাই হলেন বুদ্ধের পঞ্চবর্গীয় শিষ্য। এই পাঁচ জন হলেন বৌদ্ধ ধর্মে প্রথম ভিক্ষু। এঁদের নিয়ে তিনি প্রথম ‘ভিক্ষুসঙ্ঘ’ প্রতিষ্ঠা করেন।

তারপর যশ ও যশের চার বন্ধুকে বুদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘে গ্রহণ করলেন। তাঁদের আরও পঞ্চাশজন যুবক-বন্ধু ভিক্ষু হলেন। বুদ্ধ এই ষাটজন ভিক্ষুকে চারদিকে ধর্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। এক সময় তিনি নিজেও ধর্ম প্রচার করতে বের হলেন। তারপর কপিলাবস্তু, শ্রাবস্তী, বৈশালী, চূনার, কৌশাম্বী, কনৌজ, মথুরা, আলবী ইত্যাদি বহু জায়গায় তিনি ৪৫ বছর ধরে ধর্ম প্রচার করেন।

মহাপরিনির্বাণের আগে তিনি রাজগৃহ থেকে বৈশালী হয়ে কুশীনগর গমন করেন। কুশীনগরের পথে পাবা নগরে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। কুশীনগরে এসে তিনি মল্লদের শালবনে জোড়া শাল গাছের নিচে শয়ন করেন। আকাশে তখন বৈশাখী পূর্ণিমার চাঁদ। সজ্জী ভিক্ষুদের ডাকলেন তিনি। প্রিয় শিষ্য আনন্দ কাছে এলেন। বুদ্ধ তাঁর শেষ বাণী বললেন, হে ভিক্ষুগণ! উৎপন্ন হওয়া জীবনমাত্রেরই ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। তোমরা অপ্রমত্ত হয়ে নিজ নিজ কাজ করবে। তথাগতের এই শেষ বাণী।

রাতের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহর শেষ। শেষ প্রহরে জগতের আলো গৌতম বুদ্ধ ৮০ বছর বয়সে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।

গৌতম বুদ্ধের জীবপ্রেম

বৌদ্ধ ধর্মে জীবপ্রেমের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। জীব বলতে শুধু মানুষ নয়, সকল প্রাণীকে বোঝানো হয়েছে। এমনকি পোকামাকড়কেও তার থেকে বাদ দেওয়া হয়নি। বুদ্ধ বলেছেন, সকল জীবের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রী পোষণ করবে। বড়, ছোট, মাঝারি, ক্ষীণ, মোটা সব রকম প্রাণীকে ভালোবাসতে হবে। আর সকল প্রাণী সুখী হোক— এই কথাটি বৌদ্ধ ধর্মের একটি মূলতত্ত্ব।

পঞ্চশীলের প্রথম শীল হল, প্রাণিহত্যা করব না— এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করলাম। এ কথাটির মধ্যে জীবের প্রতি মমতা গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। পঞ্চশীলের মধ্যে এই শীলটিকে সবার আগে স্থান দেওয়া হয়েছে। কারণ প্রাণ হরণ করা গর্হিত অপরাধ। মানুষ প্রাণদান করতে পারে না এ জন্য প্রাণ নেওয়ার অধিকারও তার নেই। বনের হরিণ, বাঘ, ভালুক শিকার করা যেমন অন্যায় তেমনি গৃহপালিত প্রাণীকে হত্যা করাও পাপ।

গৌতম বুদ্ধ জীবের জন্য গভীর মমতা অনুভব করতেন। মানুষের দুঃখ দূর করার জন্য তিনি গৃহত্যাগ করেছিলেন। মানুষের জন্য জীবনের সত্য আবিষ্কার করে ‘বুদ্ধত্ব’ লাভ করেছিলেন। বাল্যকাল থেকে তিনি জীবের প্রতি প্রেম অনুভব করতেন। এখানে জীবপ্রেম সম্পর্কে তাঁর জীবনের তিনটি ঘটনার উল্লেখ করা হল :

জীবের প্রতি ভালোবাসা

এক সময় বুদ্ধ রাজগৃহের গৃধকূট পর্বতে অবস্থান করছিলেন। বিম্বিসার তখন মগধের রাজা। ভিক্ষুরা তখন নানারকম পশুর চামড়ার জুতা পায়ে দিতেন। সিংহের চামড়ার পাদুকা, বাঘের চামড়ার পাদুকা, হরিণের চামড়ার পাদুকা ব্যবহার করতেন। ভিক্ষুদের পায়ে চামড়ার পাদুকা দেখে জনসাধারণের মধ্যে নানারকম কথা উঠল। তারা বলত, শাক্যপুত্রীয় শ্রামণগণ সাধারণ গৃহীর মতো পশুর চামড়ার জুতা পরেন কেন?

এসব কথা বলে গ্রামবাসীরা ভিক্ষুদের সম্পর্কে নানারকম নিন্দা প্রচার করতে লাগল।

বুদ্ধ এসব কথা শুনে খুব ব্যথিত হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, পশুর চামড়ার তৈরী জুতা পায়ে দেওয়া উচিত নয়। এতে পশুপাখির প্রতি ভিক্ষুদের সহানুভূতি কমে যাবে। মমতা থাকবে না। এর ফলে ভিক্ষুদের মনে পশুপাখি হত্যার প্রতি আগ্রহ জাগবে। কাজেই এই ব্যবস্থা বন্ধ করা দরকার।

তখন বুদ্ধ বললেন, হে ভিক্ষুগণ, তোমরা সিংহের চামড়ার জুতা পায়ে দেবে না। সে রকম চিতাবাঘের চামড়া, হরিণের চামড়া, উদবিড়ালের চামড়া, বিড়ালের চামড়ার জুতাও পায়ে দিতে পারবে না। যদি তা কর তাহলে তোমাদের চরম অপরাধ হবে।

এই ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারি বুদ্ধ পশুপাখির প্রতি কত সহানুভূতিশীল ছিলেন। তখন থেকে ভিক্ষুদের মধ্যে চামড়ার জুতা বা পাদুকা পরা বন্ধ হয়ে যায়।

এক সময় বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথ-পিড়িকের বিহারে বাস করছিলেন। সে সময় ভিক্ষুরা নানা জায়গা থেকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। অদূরে ছিল অচীরাবতী নদী। নদীতে সব সময় নৌকা থাকত না। ভিক্ষুরা সাঁতার কেটে নদী পার হতেন। কেউ কেউ গরুর পিঠে নদী পার হতেন। রাখালরা খুশি মনে ভিক্ষুদের সাহায্য করত। তারা গরু দিয়ে ভিক্ষুদের নদী পার করে দিতে লাগল। ভিক্ষুরা গরুর পিঠে চড়ে সুখে নদী পার হতে লাগলেন। কোনো কোনো ভিক্ষু গরুর শিং ধরে নদী পার হতেন। কেউ কেউ লেজ ধরে পার হতেন। এতে গরুর খুব কষ্ট হত। আবার কখনও কখনও বাছুরের পিঠে উঠে পার হওয়ার সময় বাছুরগুলো জলে ডুবে মারা যেত।

এসব দেখে লোকজন ভিক্ষুদের সম্পর্কে নিন্দা করতে লাগল। ভিক্ষুদের দুর্নাম হতে লাগল।

ভিক্ষুরা এসব শুনতে পেয়ে বুদ্ধকে সব খুলে বললেন।

বুদ্ধ সব শুনে বুঝালেন এসব কাজ ঠিক নয়। তিনি ভিক্ষুদের ডেকে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, তোমরা গাভীর শিং ধরে নদী পার হবে না। গলা ধরে পার হতে পারবে না। লেজ ধরে বা পিঠে উঠেও পার হতে পারবে না। আর বাছুরের পিঠে চড়ে নদী পার হতে গিয়ে তাদের মৃত্যুর খবর আমি পেয়েছি। এসব অত্যন্ত খারাপ কাজ। এতে তোমাদের চরম অপরাধ হবে বলে জানবে।

বুদ্ধ গাভী ও বাছুরের কষ্ট দেখে ভিক্ষুদের জন্য এই নিয়ম প্রবর্তন করেন। গরু মানুষের উপকারী জীব। এদের কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। এ জন্য তিনি ভিক্ষুদের জন্য এই নিয়ম বেঁধে দেন।

প্রাণিহত্যা মহাপাপ। কারও কারণে কোনো গাভী মারা গেলে জন্মান্তরে সে পাপের বোঝা তাকেই বহন করতে হবে। সেদিন থেকে আর কোনো ভিক্ষু গাভী বা বাছুরের পিঠে চড়ে বা অন্যভাবে ধরে নদী পার হননি।

গাভী ও বাছুর সামান্য জীব। কিন্তু মানুষের যেমন প্রাণ আছে, গরু বাছুরেরও প্রাণ আছে। তারাও ব্যথা বেদনা অনুভব করে। তাছাড়া ওরা মানুষের অনেক উপকার করে। জীবের প্রতি বুদ্ধের ভালোবাসার এ ধরনের আরও দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন :

বুদ্ধ তখন শ্রাবস্তীতে বাস করছিলেন। ভিক্ষুদের তিনি এর আগে নানারকম পশুপাখির চামড়া ব্যবহার করতে নিষেধ

করেছিলেন। তখন কিছু ভিক্ষু ভাবলেন, বুদ্ধ গরুর চামড়া ব্যবহার করতে তো নিষেধ করেননি। কাজেই তাঁরা গরুর চামড়ার জুতা ব্যবহার করতে পারবেন।

সে সময় এক দুঃশীল ভিক্ষুর এক উপাসক ছিল। একদিন সেই দুঃশীল ভিক্ষু তার উপাসকের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলো। উপাসক ভিক্ষুকে বন্দনা করে এক পাশে বসল। সেই উপাসকের একটি সুন্দর বাছুর ছিল। বাছুরটি খুব নাদুসনুদুস ও গায়ের রং ছিল চিত্রবিচিত্র। দুঃশীল ভিক্ষু বাছুরটি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। সে বাছুরটির প্রতি লুপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

উপাসক তখন বলল, ভগ্নে, আপনি বাছুরটির দিকে এভাবে তাকিয়ে আছেন কেন?

ভিক্ষু বলল, আমার এই বাছুরটির চামড়া দরকার। এ জন্যই আমি দেখছি।

উপাসক তখন বাছুরটিকে মেরে চামড়া খুলে নিয়ে ভিক্ষুকে দিল।

দুঃশীল ভিক্ষু চামড়াটি গায়ের চীবরে ঢেকে নিয়ে বিহারের দিকে চলল। বাছুরটির মাও তখন সেই ভিক্ষুর পিছন পিছন চলল। তার চোখ দিয়ে অবিরাম জল পড়ছে আর বাছুরটিকে ডাকতে ডাকতে ভিক্ষুকে অনুসরণ করছে। ভিক্ষু বিহারে এসে পৌঁছলে অন্য ভিক্ষুরা বললেন, গাভীটি তোমার পিছে পিছে আসছে কেন?

সেই ভিক্ষু বলল, আমি জানি না।

তখন ভিক্ষুরা দেখলেন দুঃশীল ভিক্ষুর চীবর রক্তে ভিজে গেছে। ভিক্ষুরা বললেন, তোমার চীবর রক্তে লাল হয়েছে কেন?

তখন সেই ভিক্ষু ধরা পড়ে গিয়ে সব কথা স্বীকার করল।

ভিক্ষুরা বললেন, তুমি কি বাছুরটি হত্যার জন্য গৃহীকে বলেছিলে?

ভিক্ষুটি বলল, হ্যাঁ বলেছি।

একথা আস্তে আস্তে বুদ্ধের কানে গেল। তখন তিনি সেই ভিক্ষুকে ডেকে বললেন, হে ভিক্ষু, তুমি কি সত্যিই প্রাণিহত্যায় প্রেরণা দিয়েছিলে?

ভিক্ষুটি বলল, হ্যাঁ ভগবান, দিয়েছিলাম।

বুদ্ধ বললেন, কেন তুমি প্রাণিহত্যায় প্রেরণা দিয়েছিলে? আমি কি নানাভাবে প্রাণিহত্যার নিন্দা করিনি? আমি কি প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকার জন্য উপদেশ দিইনি?

তারপর বুদ্ধ ভিক্ষুসমূহকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, তোমরা প্রাণিহত্যার প্রেরণা দিতে পারবে না। যে দেবে সে অপরাধী হবে। তোমরা আজ থেকে গরুর চামড়া ব্যবহার করতে পারবে না। যে করবে সে চরম অপরাধী হবে। শুধু গরুর চামড়া নয়, তোমরা কোনো রকম পশুর চামড়া ব্যবহার করবে না।

তোমরা এই সত্য কাহিনীটি পড়ে কি বুঝলে?

বাছুরটির মৃত্যু দেখে তার মা-গাভী কষ্ট সহ্য করতে পারেনি। স্নেহের বশে সে তার সন্তানের চামড়ার পিছন পিছন ছুটেছিল। তোমরা মনে রাখবে প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে সন্তানের প্রতি গভীর ভালোবাসা রয়েছে। আর জানবে, প্রাণ এক অমূল্য সম্পদ প্রাণের চেয়ে বড় সম্পদ আর কিছুই নেই। বুদ্ধ এই বাছুরটির প্রাণের প্রতি যে মমতা দেখিয়েছেন তা অনুকরণযোগ্য। জীবনের প্রতি এই অপার করুণা পোষণ করতেন বলেই তিনি মহাকারুণিক বুদ্ধ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদের আলোকে ১, ২ এবং ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

মহামান্য দশম সংঘরাজের জাতীয় শব্দাহ অনুষ্ঠানের ধর্মীয় সভায় পণ্ডিত শীলভদ্র মহাস্থবির মহোদয় বুদ্ধের জীবন ও বাণীর উপর মনোজ্ঞ দেশনা প্রদান করেন। তিনি বোধিসত্ত্বের জন্ম, নিমিত্ত দর্শন, গৃহ ত্যাগ, বুদ্ধত্ব লাভ, এবং বুদ্ধের ধর্ম প্রচারের উপর ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তা শুনে উপস্থিত জনতা বুঝতে পারে যে মুক্তি লাভের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ অবশ্যই প্রয়োজন।

১. সিদ্ধার্থের জন্মের কয়দিন পর মহামায়ার মৃত্যু হয়?

ক. ২ দিন	খ. ৪ দিন
গ. ৬ দিন	ঘ. ৭ দিন
২. সারথী ছন্দক রথ সাজিয়ে আনলেন কেন?

ক. সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করার জন্য	খ. শুরুরালে যাওয়ার জন্য
গ. মামার বাড়ি যাওয়ার জন্য	ঘ. উদ্যান ভ্রমণে যাওয়ার জন্য
৩. রাজা শুদ্ধোদন কুমারের চোখে যাতে জরা গ্রস্ত, ব্যাধিগ্রস্ত লোক না পড়ে তা নির্দেশ দিলেন কেন?

ক. দেখলে সংসার ত্যাগ করবেন	খ. তাদের সেবা করতে আগ্রহী হবেন
গ. তিনি রাজ্যের ভার নেবেন না	ঘ. রাজা কর্মকাণ্ডে নিমিত্ত হবেন
৪. সিদ্ধি লাভের জন্য কীভাবে সাধনা করতে হয়?

ক. আহার না করে	খ. ভোগ বিলাসে রত থেকে
গ. মধ্যম পন্থা ধরে	ঘ. অগ্নি পূজা করে
৫. বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধগয়া থেকে প্রথম তিনি কোথায় এসেছিলেন?

ক. লুম্বিনী	খ. কুশীনগর
গ. শ্রাবস্তী	ঘ. সারনাথ
৬. “উৎপন্ন হওয়া জীব মাত্রেরই ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী”—এই কথা থেকে তোমাদের কী শিক্ষালাভ করা উচিত?

ক. অপ্রমত্ত হয়ে কাজ সম্পাদন	খ. আনন্দ উল্লাসে জীবন কাটানো
গ. গজায় স্নান করে পাপ মোচন	ঘ. ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেয়া
৭. বোধিসত্ত্ব চার নিমিত্তের শেষ নিমিত্ত সন্ন্যাসী দেখে পেলেন—

ক. জীবনের দিকনির্দেশনা	খ. পেলেন না কোনো সমাধান
গ. রাজ্য শাসনের ইচ্ছা	ঘ. সংসারধর্ম করার ইচ্ছা

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. একদিন অপূর্ব বড়ুয়া রাস্তা দিয়ে স্কুলে যাচ্ছিল। যাওয়ার সময় সে দেখল একটি কুকুর রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। সে কুকুরটিকে বিনা কারণে টিল ছুড়ল। এতে কুকুরটি আতর্জনাদ করতে লাগল। বৌদ্ধধর্ম অনুসারে জীবকে আঘাত করা মহাপাপ। এ ধর্মে বলা আছে সর্বজীবে দয়া কর। আমরা ইচ্ছা করলে যে কোনো জীবের প্রতি স্নেহ, মমতা প্রদর্শন করতে পারি। এক্ষেত্রে অপূর্ব বড়ুয়া গর্হিত অপরাধ করেছে।
 - ক. অপূর্ব বড়ুয়ার কুকুরকে টিল ছোড়া কী ধরনের অপরাধ?
 - খ. কুকুর সহ অন্যান্য পশুপাখিকে আঘাত করা উচিত নয় কেন?
 - গ. ইচ্ছা থাকলে যে কোনো প্রাণীর প্রতি অপার মমত্ববোধ দেখানো যায়-এ প্রসঙ্গে তোমার ভূমিকা কী হবে ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. সর্বজীবে দয়া কর-এ উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।
২. ষষ্ঠ শ্রেণীর ক্লাসে ধর্মীয় শিক্ষক, সিদ্ধার্থের জন্ম এবং গৃহত্যাগের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। গৃহত্যাগের পূর্বে তার চার নিমিত্ত দর্শনের কথাও তিনি সুন্দরভাবে ছাত্রছাত্রীদের বুঝিয়ে দেন।
 - ক. রাজ জ্যোতিষীগণ জন্মের পর সিদ্ধার্থকে দেখে কী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন?
 - খ. আমিও কি রোগে কষ্ট পাব? নিমিত্ত দর্শন কালে কেন সিদ্ধার্থ ছন্দককে এ প্রশ্ন করেছিলেন?
 - গ. একজন দায়ক কিভাবে গৃহত্যাগ করতে পারে তা ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. সিদ্ধার্থের দেখা চার নিমিত্তের ফলাফল মূল্যায়ন কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বন্দনা

বন্দনা বলতে কাউকে সম্মান জানানো বা কারও স্তুতি করা বোঝায়। এছাড়া বন্দনার আরও অর্থ আছে—যেমন : শ্রদ্ধা, ভক্তি, উপাসনা ইত্যাদি।

বন্দনা সকলকে করা যায় না। সকল ব্যক্তি বন্দনার যোগ্য পাত্র হয় না। জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিই বন্দনার উপযুক্ত পাত্র। আমরা তাঁদের শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি। তাঁদের গুণাবলির প্রশংসা করি। তাই বলা যায়, জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও তাঁদের গুণাবলির স্তুতি করার নামই বন্দনা।

‘বুদ্ধ’ শব্দের অর্থ জ্ঞানী। বুদ্ধ অনন্ত গুণ ও জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাই আমরা বুদ্ধের বন্দনা করি, উপাসনা করি। এই বন্দনা ও উপাসনার উদ্দেশ্য হল বুদ্ধের অনন্ত গুণের অনুশীলন ও অনুসরণ করা। তাঁর মহান আদর্শ নিজ জীবনে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হওয়া।

আমরা শুধু বুদ্ধকেই বন্দনা করি না। বুদ্ধের ধর্মকে বন্দনা করি, সঙ্ঘকে বন্দনা করি। এছাড়া আমরা বুদ্ধের অস্থিধাতুর বন্দনা করি। বোধিবৃক্ষ ও চৈত্যের বন্দনা করি। বিভিন্ন তীর্থ স্থানের বন্দনা করি। মাতাপিতাকেও আমরা বন্দনা করে থাকি।

বন্দনার সুফল অনেক। বন্দনা করলে মানুষের মন পবিত্র হয়। মন থেকে পাপ দূর হয়, পুণ্যলাভ হয়। চিত্ত শুদ্ধ হয়, অশান্ত মন শান্ত হয়। লোভ, দ্বেষ, মোহ কেটে যায়। অন্যায় কাজ করার ইচ্ছা জাগে না। মিথ্যা কথা বলার ইচ্ছা হয় না। সৎ চিন্তা ও পরের উপকার করার বাসনা জাগে। সৎ চরিত্রের অধিকারী হওয়া যায়। ইহলোক ও পরলোকে সুখ হয়।

বন্দনা একটি সৎ ও পুণ্যকর্ম। মানব জীবনে এর প্রভাব অপরিসীম। তাই সকলেরই প্রতিদিন সকাল বিকাল দুবেলা বন্দনা করা উচিত। বুদ্ধ মূর্তি বা বুদ্ধের ছবির সামনে বসে মা বাবা, ভাইবোন সকলে একসাথে বন্দনা করলে ভালো হয়। বিহার কাছে থাকলে বিহারে গিয়ে বন্দনা করা যায়। আর দূরে হলে মাঝে মাঝে হলেও বিহারে গিয়ে বন্দনা করা উচিত। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, উপাসক উপাসিকাদের সাথে একসঙ্গে বসে বন্দনাকে সমবেত বন্দনা বলা হয়। সমবেত বন্দনা করলে বেশি পুণ্যলাভ হয়। এতে সকলের মধ্যে বন্ধুত্ব, সহমর্মিতা ও মৈত্রীভাব বৃদ্ধি পায়। পরস্পর মিলেমিশে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের আগ্রহ বাড়ে। তাই সমবেত বন্দনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বন্দনা কীভাবে করবে? বন্দনা করার আগে মুখ হাত ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার কাপড় পরবে। এতে দেহ পরিচ্ছন্ন হয়। মনও পবিত্র হয়। পবিত্র দেহ ও মনে বন্দনা করলে একাগ্রতা বাড়ে। বুদ্ধ বন্দনার সময় বুদ্ধমূর্তি বা বুদ্ধের ছবির সামনে হাঁটু ভেঙে বসতে হয়।

তারপর দুই হাতের তালু যুক্ত করে মনোযোগ সহকারে সুর করে বন্দনার গাথা আবৃত্তি করতে হবে। আবৃত্তি স্পষ্ট হওয়া উচিত। বুদ্ধ বন্দনার শেষে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে ভক্তি সহকারে প্রণাম করবে। এভাবে প্রত্যেক বন্দনা বা গাথার শেষে প্রণাম করতে হয়।

এবার আমরা কিছু বন্দনা শিখব। এর আগেও আমরা বেশ কিছু বন্দনা শিখেছি। আমরা দন্তধাতু বন্দনা, চৈত্য বন্দনা ও সন্তমহাস্থান বন্দনা শিখব।

দন্তধাতু বন্দনা

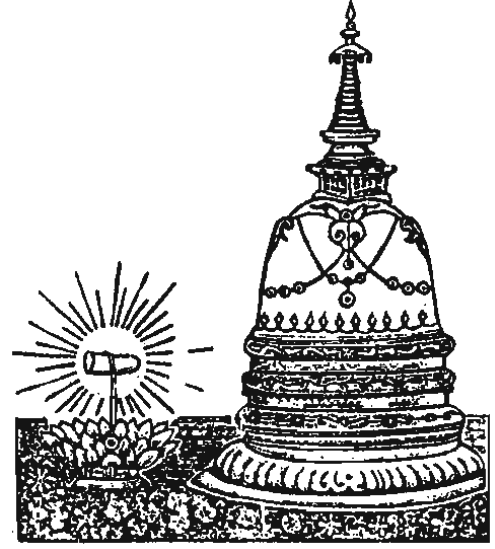
বুদ্ধের বিভিন্ন অস্থিধাতু আমাদের কাছে অতি পবিত্র। দন্তধাতু তাদের অন্যতম। স্বর্গ ও মর্ত মিলে চারটি স্থানে খুব যত্ন সহকারে বুদ্ধের দন্তধাতু রক্ষিত আছে। একটি তাবতিংস স্বর্গে, একটি নাগলোকে, একটি গান্ধার রাজ্যে ও একটি শ্রীলংকায়। এখন আমরা দন্তধাতু বন্দনা শিখব।

দন্তধাতু বন্দনা নিম্নরূপ

একা দাঠা তিদসপুরে, একা নাগপুরে অহু;
একা গম্ধার বিসম্বে, একাসি পুন সীহলে,
চতস্সো তা মহাদাঠা নিব্বানরসদীপিকা
পূজিতা নরদেবেহি, তা'পি বন্দামি ধাতুযো।

পদ্যানুবাদ

শ্রীবুদ্ধের একদন্ত	ত্রিদেশ নগরে,
আর এক দন্তবর	আছে নাগপুরে।
একদন্ত আছে তাঁর	গাম্ধার রাজ্যেতে,
শোভে নিজ একদন্ত	শ্রীলংকা দীপেতে।
নির্বাণ রসোদীপক	এ চারি দন্তেরে,
ভক্তিয়ুত হয়ে সদা	পূজে দেব নরে।



দন্তধাতু চৈত্য

মহা ঋদ্ধিশালী এই দন্তধাতু ধন, ভক্তিয়ুক্ত চিন্তে আমি বন্দি সর্বক্ষণ।

বঙ্গানুবাদ

বুদ্ধের একটি দন্ত তাবতিংস স্বর্গে, একটি নাগলোকে, একটি গাম্ধার রাজ্যে, আরেকটি সিংহল দীপে রয়েছে। নির্বাণ রস প্রদানকারী এই চারটি মহাদন্ত নর ও দেবগণের দ্বারা পূজিত হয়। আমিও সেই চার দন্তধাতুকে বন্দনা করছি।

চৈত্য বন্দনা

পালি 'চেতিয়াম' থেকে চৈত্য শব্দটি এসেছে।

চৈত্য শব্দের অর্থ বুদ্ধের পবিত্র দেহধাতু রাখার স্থান। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর তাঁর দেহধাতু যেসব স্থানে রাখা হয়েছিল তার নাম হয় চৈত্য। এছাড়া বুদ্ধের শ্রাবক সঙ্ঘের উদ্দেশ্যেও চৈত্য নির্মিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য চৈত্য রয়েছে। আমরা এই সব চৈত্যের বন্দনা করে থাকি।

চৈত্য বন্দনা নিম্নরূপ

বন্দামি চেতিয়ং সর্বং সর্বট্টানেনসু পতিট্টীতং,
সারীরিক-ধাতুং মহাবোধিৎ বুদ্ধরূপং সকলং সদা।

পদ্যানুবাদ

সর্ব চৈত্য বন্দি আমি সর্বস্থানে স্থিত
শারীরিক ধাতু বন্দি ভক্তিয়ুত চিত।
মহাবোধি বন্দি আর ভক্তিয়ুক্ত মন
বুদ্ধের মরতি যত বন্দি অনুক্ষণ।

বঙ্গানুবাদ

সকল স্থানে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধের শারীরিক ধাতু, মহাবোধিবৃক্ষ ও সমস্ত বুদ্ধরূপকে আমি সর্বদা বন্দনা করছি। এভাবে ধাতু ও চৈত্য বন্দনা করবে। চৈত্য স্থাপন করবে। বোধিবৃক্ষ রোপণ করবে। বুদ্ধের মূর্তি বা ছবি প্রতিষ্ঠা করবে। এতে পুণ্য লাভ হয়। নির্বাণ লাভের পথও সুগম হয়।

সন্তমহাস্থান

বুদ্ধত্ব লাভের পর পরই গৌতম বুদ্ধ সেই স্থান ত্যাগ করেননি। বোধিবৃক্ষের আশেপাশে তিনি কিছুদিন কাটিয়েছেন। এ সময়ে তিনি কখনও পদচারণা করেছেন। কখনও কোথাও বসে আবার ধ্যানে মগ্ন হয়েছেন। কোথাও বসে তাঁর ধর্মের নানা বিষয় নিয়ে চিন্তা করেছেন। বোধিবৃক্ষের চারপাশে এরকম সাতটি স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। এ স্থানগুলো অত্যন্ত পবিত্র ও পুণ্যময়। সাতটি মহাস্থান হচ্ছে— বোধিপালঙ্ক, অনিমেষ চৈত্য, চক্রমণ চৈত্য, রত্নঘর চৈত্য, অজপাল ন্যাগ্রোধ বৃক্ষ, মুচলিন্দ মূল ও রাজায়তন বৃক্ষ। এই সাতটি স্থানকে সন্তমহাস্থান বলা হয়। সাতটি মহাস্থান বৌদ্ধদের কাছে অতি পবিত্র। এর মধ্যে শেষের তিনটির কোনো চিহ্ন এখন নেই। বুদ্ধগয়াতে তীর্থ করতে গেলে চারটি স্থান দেখা যায়। এই সাতটি মহাস্থানের বন্দনা করলে মনে বুদ্ধের স্মৃতি জাগ্রত হয়। এতে মন পবিত্র হয়। মনের পবিত্রতা মানুষকে সুখী করে।

সন্তমহাস্থান গাথা নিম্নরূপ

পঠমং বোধিপল্লঙ্কং, দ্বিতীয়ং অনিমিসম্পি চ,
ততীয়ং চক্রমণং সেট্টং, চতুর্থং রতনঘরং,
পঞ্চমং অজপালঞ্চ, মুচলিন্দঞ্চ ছট্ঠমং
সত্তমং রাজায়তনং, বন্দে তং বোধিপাদপং

পদ্যানুবাদ

বোধিপালঙ্ককে করি প্রথমে বন্দনা,
অনিমেষ স্থানে করি দ্বিতীয় বন্দনা।
তৃতীয়ে বন্দনা করি স্থান চক্রমণ,
চতুর্থে বন্দনা করি রত্নঘর স্থান।
অজপাল ন্যাগ্রোধকে পঞ্চমে প্রণাম,
ষষ্ঠিতে বন্দনা করি মুচলিন্দ নাম।
সন্তমেতে বন্দি আমি রাজায়তন বর,
তারি সাথে নমি আমি বোধি তরুবর।

বঙ্গানুবাদ

প্রথম বোধিপালঙ্ক, দ্বিতীয় অনিমেষ স্থান, তৃতীয় চক্রমণ স্থান, চতুর্থ রত্নঘর স্থান, পঞ্চম অজপাল ন্যাগ্রোধ বৃক্ষ, ষষ্ঠ মুচলিন্দ মূল, সন্তমে রাজায়তনসহ বোধিবৃক্ষকে আমি বন্দনা করছি।

সকাল সন্ধ্যা বন্দনা করার সময় সন্তমহাস্থানের বন্দনাও তোমরা নিয়মিত করবে। এতে তোমাদের ইহজন্ম ও পরজন্মের জন্য অনেক পুণ্য সঞ্চিত হবে। তোমাদের মঙ্গল হবে। বন্দনার প্রভাবে অন্তরে মৈত্রীভাব জাগ্রত হবে। সকল জীবের প্রতি ভালোবাসা জাগবে। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাভাব বাড়বে। ছোটদের প্রতি মমত্ব জাগবে। শত্রুমিত্র সকলকে প্রশংসা করতে পারবে, ভালোবাসতে পারবে। বন্দনা সং জীবন গঠনের অন্যতম প্রধান উপায়— এ কথাটি আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদের আলোকে ১ এবং ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রজাজ্যোতি স্থবির মহোদয় ভিক্ষু সংঘ নিয়ে বান্দরবান গমন করেন। সেখানে ধর্মীয় সভায় দেশনাতে বন্দনা সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি বন্দনার পরিচিতি, গুরুত্ব, দম্ভাত্ম বন্দনা, চৈত্য বন্দনা, সপ্তমহাস্থান বন্দনাসহ আরো কয়েকটি বন্দনার বঙ্গানুবাদ, পদ্যানুবাদও উল্লেখ করেন।

১. বন্দনা করার প্রয়োজন কেন ?

- মনের পবিত্রতা আনয়নের জন্য
- পুণ্য সম্পদ লাভ করার জন্য
- গুরুকে খুশি করার জন্য

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|-------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. i ও iii | ঘ. ii ও iii |

২. সমাজে বন্দনার গুরুত্ব উপলব্ধির জন্য কি করা প্রয়োজন?

- সর্বত্র বিহার স্থাপন করা
- বন্দনার সুফল সম্পর্কে বোঝানো
- বন্দনার বই সরবরাহ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|------------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii এবং iii |

৩. সমবেত বন্দনা হল-

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| ক. সকাল বেলায় বন্দনা | খ. সন্ধ্যাকালীন বন্দনা |
| গ. সকলে একত্রে বন্দনা | ঘ. একা বসে বন্দনা |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বিপাশা চাকমা ওষ্ঠ শ্রেণীর বৌদ্ধধর্মীয় বইয়ের বন্দনা অধ্যায়টি মন দিয়ে পড়েন। তিনি জানলেন যে নিজের থেকে জ্ঞানী-গুণী এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বন্দনা পাওয়ার উপযুক্ত পাত্র। শুধু বুদ্ধকেই নয়, বুদ্ধের ধর্ম, সংঘ, বুদ্ধের অস্থি ধাতু, বোধিবৃক্ষ, চৈত্য, তীর্থ স্থান, মাতাপিতা, শিক্ষা শুরু এবং দীক্ষা গুরুই বন্দনা পাওয়ার উত্তম ক্ষেত্র। বন্দনা করলে অশান্ত মন শান্ত হয়। বন্দনা সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করলেন।

- বন্দনা কাকে বলে?
- বন্দনা করার উদ্দেশ্য কী?
- কীভাবে বন্দনা করার জন্য তুমি মানুষকে বলবে?
- ‘বন্দনা করলে অশান্ত মন শান্ত হয়’-এ উক্তিটির পক্ষে যুক্তি দেখাও।

তৃতীয় অধ্যায়

শীল

শীলের তাৎপর্য

গৌতম বুদ্ধ মানুষের চরিত্র সুন্দর করার জন্য কতকগুলো নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন। সেই নিয়মগুলো শীল নামে অভিহিত। শীল শব্দের অর্থ চরিত্র বা স্বভাব। এ ছাড়া শীলের আরও অর্থ আছে। সেগুলো হল- আশ্রয়, সংযম, শৃঙ্খলা, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

যাঁরা এই শীল পালন করেন তাঁদের বলা হয় শীলবান। শীল পালনের দ্বারা দেহ ও মনকে সংযত করা যায়। মানুষ সুন্দর সুন্দর অলংকার পরে। যেমন সোনা, রুপা, মণি ও মুক্তা প্রভৃতি। এসব অলংকার পরলে মানুষের দেহের সৌন্দর্য বাড়ে। এসবের চেয়েও বড় অলংকার হল শীল। অলংকারের দ্বারা দেহের সৌন্দর্য বাড়ে। শীল পালনের দ্বারা মনের সৌন্দর্য বাড়ে।

শীল পালনের অনেক সুফল আছে। শীল পালনের দ্বারা মনের কালিমা দূর হয়। কথাবার্তা, চালচলন, আচার ও ব্যবহার সংযত হয়। ফলে মানুষ বিনয়ী ও ভদ্র হয়। এতে বুদ্ধি ও জ্ঞান বাড়ে। ভালো ও মন্দে মধ্যে পার্থক্য বুঝতে শেখে। শীল পালন অন্যায্য কাজ থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করে। তোমরাও শীল পালন করবে।

জীবহত্যা, মিথ্যা বলা, পরের ধন চুরি করা, ব্যভিচার ও সুরা-মদ পান করা পাপ। এসব থেকে যারা দূরে সরে থাকতে পারে না তারা নরকে যায়। ধার্মিকেরা এসব কাজ থেকে বিরত থাকেন। তাঁরা শীল গ্রহণ ও পালন করেন। এতে নৈতিক জীবন গঠিত হয়। নির্বাণ লাভের পথ সুগম হয়।

পৃথিবীতে যত মহাপুরুষ আছেন তাঁরা সকলেই শীলবান। এ জন্য তাঁরা সবার কাছে শ্রদ্ধার পাত্র। গৌতম বুদ্ধ এরকম একজন মহাপুরুষ। তিনি মানুষের মজ্জলের জন্য এই শীল পালনের নিয়ম প্রবর্তন করেছেন। তোমরা নিয়মিত বৌদ্ধ বিহারে গিয়ে শীল গ্রহণ করবে। তবে বিহারে না গিয়েও শীল পালন করা যায়।

পঞ্চশীল

পঞ্চশীল গ্রহণের জন্য বিহারে গিয়ে ভিক্ষুর কাছে সূত্রের মাধ্যমে প্রার্থনা জানাতে হয়। হাঁটু ভেঙে বসে দুই হাত জোড় করে প্রার্থনা করতে হয়। প্রার্থনা এরূপ :

ওকাস অহং ভন্তে, তিসরগেন সহ পঞ্চসীলং

ধম্মং যাচামি, অনুগ্গহং কত্ত্বা ও সীলং দেথ মে ভন্তে।

দুতিযম্পি... ততিযম্পি অহং ভন্তে, তিসরগেন সহ পঞ্চসীলং ধম্মং যাচামি, অনুগ্গহং কত্ত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

অনুবাদ

ভন্তে, অবকাশ দিন। আমি ত্রিশরগেন সহ পঞ্চশীল প্রার্থনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন। দ্বিতীয়বার... তৃতীয়বারও ভন্তে, আমি ত্রিশরগেন সহ পঞ্চশীল প্রার্থনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

ভিক্ষু- যমহং বদামি তং বদেথ। অর্থাৎ, আমি যা বলছি তা বলুন।

শীলপ্রার্থনাকারী- আম ভন্তে। অর্থাৎ, হাঁ প্রভু বলছি।

এই সম্মতি প্রদানের পর ভিক্ষু প্রথমে ত্রিশরণ দেবেন।

ত্রিশরণ

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি

ধম্মং সরণং গচ্ছামি

সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।

দুতিয়ম্মি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি

দুতিয়ম্মি ধম্মং সরণং গচ্ছামি

দুতিয়ম্মি সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি

ততিয়ম্মি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি

ততিয়ম্মি ধম্মং সরণং গচ্ছামি

ততিয়ম্মি সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি

ভিক্ষু- সরণাগমনং সম্পূর্ণং।

শীল প্রার্থনাকারী- আম ভন্তে

অনুবাদ

বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি।

ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি।

সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করছি।

দ্বিতীয়বারও বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি।

দ্বিতীয়বারও ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি।

দ্বিতীয়বারও সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করছি।

তৃতীয়বারও বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি।

তৃতীয়বারও ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি।

তৃতীয়বারও সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করছি।

ভিক্ষু-শরণ গ্রহণ সম্পূর্ণ হল।

শীল প্রার্থনাকারী- হাঁ ভন্তে।

এর পর ভিক্ষু পঞ্চশীল দেবেন।



পঞ্চশীল প্রার্থনা

পঞ্চশীল

১. পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।
২. অদিন্দাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।
৩. কামেসু মিচ্ছাচারে বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।
৪. মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।
৫. সুরামেরেয –মজ্জ-পমাদট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

অনুবাদ

১. প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকব- এই শিক্ষা গ্রহণ করছি।
২. অদত্ত বস্তু গ্রহণ থেকে বিরত থাকব- এই শিক্ষা গ্রহণ করছি।
৩. ব্যভিচার থেকে বিরত থাকব- এই শিক্ষা গ্রহণ করছি।
৪. মিথ্যাবাক্য বলা থেকে বিরত থাকব- এই শিক্ষা গ্রহণ করছি।
৫. সুরাজাতীয় মাদক দ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকব- এই শিক্ষা গ্রহণ করছি।

পঞ্চশীলের পরিচিতি

পঞ্চশীলের প্রথম শীলে প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে। পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় এক বিখ্যাত ব্রাহ্মণ ছিলেন। সে সময় বোধিসত্ত্ব বৃক্ষদেবতা হয়ে জন্মেছিলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণ মৃত ব্যক্তিদের প্রেতাত্মার শান্তির জন্য একটি ছাগল বলি দিতে নিয়ে এলেন। তিনি ছাগলটিকে স্নান করিয়ে আনার জন্য শিষ্যদের আদেশ দিলেন। তখন সেই ছাগলের অতীত জীবনের কথা মনে পড়ল এবং বুঝতে পারল এই জন্মের পর তার দুঃখের অবসান হবে। এই ভেবে ছাগলটি শব্দ করে হেসে উঠল। তারপর তাকে বলি দেওয়ার ফলে ব্রাহ্মণের দুঃখভোগ শুরু হবে ভেবে আবার চিৎকার করে কেঁদে উঠল। শিষ্যরা এই দেখে ছাগলটিকে গুরুর কাছে নিয়ে গেল।

গুরুর কাছে যাওয়ার পর ছাগল তার পূর্বজন্মের সব কথা খুলে বলল। ছাগল বলল সেও এক সময় ব্রাহ্মণ ছিল। সেই জন্মে সে ছাগল বলি দিয়ে মৃত পূর্বপুরুষের জন্য দানধর্ম করেছিল বলে আজ তার এই দশা। সেজন্য সে ৪৯৯ বার ছাগল হয়ে জন্মেছিল এবং মাথা কাটার যন্ত্রণা ভোগ করেছিল। এই জন্মে তার দুঃখের শেষ হবে এবং ব্রাহ্মণের অশেষ দুর্গতি শুরু হবে। এ জন্য সে নিজের দুঃখের অবসান হবে বলে হেসেছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণের দুঃখের শুরু হবে বলে আবার কেঁদেছিল।

ব্রাহ্মণ তখন ছাগলটিকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু বজ্রাঘাতে ছাগলটির মাথা কাটা পড়ে। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে সবাই অবাক হয়ে যায়। বৃক্ষদেবতা বোধিসত্ত্ব তখন প্রাণিহত্যার কুফল সম্পর্কে সকলকে উপদেশ দেন। প্রাণিহত্যার ফলে কত জন্ম নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় তা তিনি বুঝিয়ে বলেন।

পঞ্চশীলের দ্বিতীয় শীল অদত্ত জিনিস গ্রহণ না করার শিক্ষা। অর্থাৎ কোনো জিনিস কেউ না দিলে তা গ্রহণ করলে চুরি করা হয়। চুরি করা মহাপাপ। স্কুলের সহপাঠীর ছোট পেন্সিলটি না বলে নেওয়াও চুরি। কারও গাছ থেকে না বলে একটি আম খাওয়াও চুরি। চুরির পাপের ফল ভয়াবহ হয়। ‘পুষ্পরক্ত জাতকে’ এ কথা সুন্দর করে বলা হয়েছে। এই জাতকে এক গরিব লোকের স্ত্রী শাড়ি রাঙানোর জন্য তার স্বামীকে রাজার বাগানের মূল্যবান ফুল চুরি করতে বলে। লোকটি স্ত্রীর কথায় সেই মূল্যবান ফুল চুরি করতে গিয়ে রাজার মালীর হাতে ধরা পড়ে, তাতে তার মৃত্যুদণ্ড হয়। মৃত্যুর পর সে নরকে যায়। কাজেই চুরির ফল কত ভয়াবহ হয় তা তোমরা বুঝতে পারছ।

পঞ্চশীলের তৃতীয় শীলে ব্যভিচার থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে। ব্যভিচার বলতে নারীজাতির ওপর অত্যাচার বোঝায়। নিজের মা ও বোনকে যেমন তোমরা শ্রম্বা কর তেমনি সকলের মা ও বোনকে শ্রম্বা করবে। তাদের প্রতি সম্মান দেখাবে। এর ফল দেশে আর ব্যভিচার থাকবে না।

পঞ্চশীলের চতুর্থ শীল মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা। মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না। মিথ্যাবাদীরা সকলের ঘৃণার পাত্র। ‘অনুশাসক জাতকে’ একটি সুন্দর কাহিনী আছে। সেই জাতকের বর্তমান কথায় আছে এক ভিক্ষুণী সব সময় মিথ্যা কথা বলতেন। মিথ্যা কথা বলার ফলে তিনি একদিন উরু ভেঙে ফেলেন। তারপর সে কথা ভিক্ষুণী সমাজে প্রচার হয়ে যায়। ভিক্ষুণীরা তখন বলতে লাগলেন, ইনি আমাদের এত সাবধান করতেন কিন্তু নিজে সেই নিষিদ্ধ জায়গায় ভিক্ষা করতে যেতেন। অথচ যাওয়ার কথা অস্বীকার করতেন বা মিথ্যা বলতেন। একদিন সেখানে গিয়ে ভেড়ার শিঙের গুঁতো খেয়ে তিনি উরু ভেঙে এলেন। মিথ্যা কথা বলার ফল ভিক্ষুণী হাতে হাতে পেলেন।

পঞ্চশীলের পঞ্চম শিক্ষা হচ্ছে সুরাজাতীয় মাদক দ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকা। এর মধ্যে মদ, গাঁজা, ভাং, তাড়ি, ধূমপান ইত্যাদি সবকিছুর কথা বলা হয়েছে। সুরা পান করলে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। বোধশক্তি হারিয়ে ফেলে। বিচার ও বিবেচনা করার ক্ষমতা লোপ পায়। ভালো ও মন্দ কী তা বুঝতে পারে না। তখন সুরাপায়ী লোক সহজে নানারকম পাপ কাজ করে ফেলে। তারপর সে ধনসম্পদ নষ্ট করতে থাকে। পরিণামে তার জীবনে দুঃখ নেমে আসে। সমাজেও সে কোনো সম্মান পায় না। সুরাপানের মতো ধূমপানও স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। তামাক, গাঁজা, ভাং, প্রভৃতি মাদকদ্রব্যে আসক্তির ফলে স্বাস্থ্যের প্রভূত ক্ষতি হয়। এমনকি সিগারেট বা তামাক পোড়া গন্ধ অধূমপায়ীরও ক্ষতি করে। পিতামাতা ধূমপান করলে ছেলেমেয়ের নিঃশ্বাসের সঙ্গে সেই ধোঁয়া তাদের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। কাজেই এই ধোঁয়া তাদের জন্যও সমান ক্ষতিকর। বৃন্দ বলেছেন, এই জাতীয় নেশা গ্রহণ করে মত্ত হওয়া উচিত নয়।

‘ভদ্রঘট জাতকে’ এক সুরাপায়ীর করুণ পরিণতির কথা বলা হয়েছে। এই জাতকের কাহিনী হল বোধিসত্ত্বের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে সুরাপান করে সব ধন হারিয়ে ফেলে। তারপর পথে পথে ভিক্ষা করে জীবনধারণ করতে লাগল। বোধিসত্ত্ব তখন মৃত্যুর পর স্বর্গে দেবতাদের রাজা হয়ে জন্মেছেন। তিনি নিজের ছেলের করুণ অবস্থা দেখে তাকে একটি ঘট দেন। সেই ঘটের প্রভাবে ছেলের অবস্থা ভালো হয়। একদিন সে আবার সুরাপান করে মাতাল হয়ে যায় এবং ঘটটি ভেঙে ফেলে। ফলে তার অবস্থা আবার খারাপ হয়ে যায়। তখন সে আবার ভিক্ষা করতে শুরু করে। তারপর একদিন ভিক্ষা করতে করতে সে মারা যায়।

এভাবে আমরা দেখতে পাই পঞ্চশীলের গুণ কত বেশি। ইচ্ছা করলে আমরা এই পাঁচটি শীল পালন করতে পারি। তোমরা সবাই নিয়মিত পঞ্চশীল গ্রহণ করবে ও পালন করবে। বিহারে গিয়ে বিভিন্ন তিথিতে পঞ্চশীল গ্রহণ করবে। প্রতিদিন পঞ্চশীল পালনের অভ্যাস করবে। অভ্যাস করতে করতে দেখবে তুমি পাঁচটি শীল কেমন সহজে পালন করতে পারছ। এর ফলে জীবন সুন্দর হবে। যারা পঞ্চশীল পালন করে না তাদের জীবনে নানা দুঃখ নেমে আসে এবং মৃত্যুর পর তারা অপয়াদি নানা দুর্গতি ভোগ করে। যারা পঞ্চশীল পালন করে তারা দীর্ঘায়ু লাভ করে এবং তাদের জীবন সুখকর হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. শীল শব্দের অর্থ কী?

ক. সংযম	খ. প্রতিষ্ঠা
গ. চরিত্র	ঘ. ন্যায়নিষ্ঠা
২. শীলবান হওয়ার উৎকৃষ্ট উপায়-

ক. জ্ঞান চর্চা করা	খ. সংযত ব্যবহার করা
গ. নৈতিক উৎকর্ষ সাধন করা	ঘ. দেহের যত্ন নেওয়া
৩. কীভাবে তোমার জীবনে সুখশান্তি বয়ে আনবে?

ক. কুশল কর্ম সম্পাদন দ্বারা	খ. আধ্যাত্মিক চিন্তা করার মাধ্যমে
গ. টাকা পয়সা রোজগারের দ্বারা	ঘ. উচ্চ শিক্ষিত হওয়ার দ্বারা
৪. দুর্নীতিগ্রস্ত কোনো দেশ বা জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। বাংলাদেশের মতো দেশে এই দুর্নীতির কারণ-
 - i. ধর্মীয় নীতিবোধ থেকে বিচ্যুত হওয়া
 - ii. জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ দরিদ্র থাকা
 - iii. বিষয়বস্তুর বিষময় প্রভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. i ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বিনয় বড়ুয়ার স্ত্রী শাড়ি রাঙানোর জন্য তার স্বামীকে রাজার বাগানের মূল্যবান ফুল চুরি করতে বলে। তিনি স্ত্রীর কথায় সেই মূল্যবান ফুল চুরি করতে গিয়ে রাজার মালীর হাতে ধরা পড়েন। রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। এ ঘটনার মর্মানুসারে আমাদের সবারই চরিত্রের দোষ ত্রুটিগুলো শুধরে নেওয়া উচিত এবং নিজের জীবনকে কালিমা ও কলুষমুক্ত রাখা উচিত।

ক. কোন জাতকে এ ঘটনাটি উল্লেখ আছে?	খ. 'চুরি করা মহাপাপ'-ব্যাখ্যা কর।
গ. তুমি কীভাবে নিজের জীবনকে কালিমামুক্ত করবে?	ঘ. রাজা একজন ক্ষিপ্ত মেজাজের চরিত্র-তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।
২. অমিয় মুৎসুদ্দী তার গ্রামে বৌদ্ধ বিহারে গিয়ে ধর্মীয় আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রজ্ঞাজ্যোতি কর্মবাদ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ পেশ করেন। তিনি বলেন কর্মই ধর্ম, কর্মই শত্রু, কর্মই বন্ধু, কর্মই সর্বদুঃখের উৎপত্তি ও বিনাশ। তিনি কুশল ও অকুশল কর্ম সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন। কুশল কর্মে মানুষের উন্নতি সাধন ও অকুশল কর্মে মানুষের নৈতিক অধঃপতন ঘটে। অকুশল কর্মপ্রসঙ্গে তিনি মদ্যপান, প্রাণিহত্যা, চুরি করা ইত্যাদি কর্মের উদাহরণ দেন। অমিয় মুৎসুদ্দী ভিক্ষুকে লোভ, প্রাণিহত্যা, মানুষের অনিষ্ট সাধন ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাখ্যা চাইলে তিনি চুল্লকর্ম বিভাজন সূত্রে পাঠের মাধ্যমে সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। এভাবে অমিয় মুৎসুদ্দী তার অকুশল কর্ম সম্পর্কে সজাগ ও ভীত হয়ে যান।

- ক. কর্মবাদ কী?
- খ. ‘কর্মই মানুষের বন্ধু’-বিশ্লেষণ কর।
- গ. কীভাবে অমিয় মুৎসুদ্দীকে তার অকুশল কর্ম থেকে পরিত্রাণ করা যায়?
- ঘ. যে কোনো দুটি কুশল কর্মের ফলাফল মূল্যায়নপূর্বক তোমার মতামত ব্যক্ত কর।
৩. অমৃত মুৎসুদ্দী একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করেন। যদিও রাত ৮টা পর্যন্ত তাকে অফিসে থাকতে হয়। কিন্তু তিনি প্রতিদিন অধিক রাত করে বাড়ি ফেরেন। তিনি মদ, গাঁজা, ধূমপান ইত্যাদির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছেন। প্রতিদিন স্ত্রীর সাথে ঝগড়া হয়। পাশাপাশি ছেলেদের মানসিক অশান্তিও ঘটে। বৌদ্ধ ধর্মের নীতি অনুযায়ী উক্ত ব্যক্তি শীল ভঙ্গ করছেন। তাকে খারাপ সজ্ঞা পরিহার করে নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। নৈতিক চরিত্র উন্নয়নে শীলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।
- ক. শীল কী?
- খ. নেশার কুফল বর্ণনা কর।
- গ. কীভাবে অমৃত মুৎসুদ্দীকে নেশামুক্ত করা যায় তা সংক্ষেপে আলোচনা কর।
- ঘ. অমৃত মুৎসুদ্দীর নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন ঘটানোর প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে তোমার মতামত ব্যক্ত কর।

চতুর্থ অধ্যায়

সূত্র ও নীতিগাথা

মজ্জল শব্দের অর্থ শুভ, কল্যাণ। মজ্জল কামনা করা অর্থ আমরা বুঝি শুভ প্রার্থনা বা কল্যাণ কামনা।

ত্রিপিটক গ্রন্থে মজ্জল সূত্র একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। মজ্জল সূত্র ত্রিপিটকের খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত। এই খুদ্দক নিকায়ের প্রথম গ্রন্থ ‘খুদ্দক পাঠো’। খুদ্দক পাঠো বইয়ের মধ্যে এই মজ্জল সূত্র আছে। খুদ্দক পাঠো শব্দের অর্থ সর্বাঙ্গীকৃত পাঠ বা আবৃত্তি। ভিক্ষু বা গৃহী সকলেই আমরা এই সূত্রগুলো পাঠ করে থাকি।

গৌতম বুদ্ধের সময় ভারতবর্ষের নাম ছিল জম্বুদ্বীপ। তখন জম্বুদ্বীপের নগরদ্বারে ও সভাগৃহে অনেক লোক মিলিত হত। এভাবে মিলিত হয়ে নানা বিষয়ে আলোচনা করত। এরকম একেক বারের আলোচনা চার মাস পর্যন্ত চলত। সেরকম এক আলোচনায় মজ্জল সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠল, মজ্জল কী? ভালো কোনো কিছু দেখলে কি মজ্জল হয়? অথবা ভালো কিছু শুনলে বা ভালো কিছুর ঘ্রাণ নিতে পারলে কি মজ্জল হয়? এভাবে মজ্জল সম্পর্কে নানারকম প্রশ্ন উত্থাপিত হল।

একজন বললেন, মজ্জল কী আমি জানি। জগতে ভালো কিছু দেখলে মজ্জল হয়। যেমন, খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে প্রথমে পাখি দেখলে মজ্জল হয়। সেরকম সুন্দর পোশাক পরা কোনো কুমারকে দেখলে মজ্জল হয়। ভরাকলসি ও গর্ভবতী নারী দেখলে মজ্জল হয়। সিন্ধু ঘোড়া বা ঘোড়ার রথ দেখলে মজ্জল হয়। তাঁর কথা শুনে কেউ কেউ বিশ্বাস করল, কেউ কেউ করল না। অবিশ্বাসীরা মজ্জল বিষয় নিয়ে আবার ঝগড়া শুরু করল।

তারপর আর একজন বললেন, দেখার মধ্যে নয়, শোনার মধ্যেই মজ্জল। তিনি আরও বললেন, আপনি তো দেখার কথা বললেন। দেখার মধ্যেও পার্থক্য আছে। যেমন পবিত্র জিনিস দেখলে এক রকম, অপবিত্র জিনিস দেখলে অন্য রকম ফল হয়। তেমনি সুন্দর জিনিস দেখলে একরকম, আবার অসুন্দর জিনিস দেখলে অন্যরকম ফল হবে। কাজেই কোন কিছু দেখার জন্য মজ্জল হতে পারে না। বরং শোনার মধ্যে মজ্জল নিহিত আছে। যেমন, যদি কোনো মানুষ সকালে উঠে মল্লোচ্চারণের শব্দ শোনে তাহলে তার মজ্জল হয়। সুন্দর কোনো শব্দ শুনলেও মজ্জল হয়। আবার মজ্জলজনক ঘণ্টার শব্দ শুনলেও মজ্জল হয়। সেরকম আনন্দজনক শব্দ শুনলেও মজ্জল হয়। এর নাম ‘শ্রুতিমজ্জল’। তাঁর কথাও কেউ কেউ বিশ্বাস করল, কেউ কেউ করল না।

আর একজন বললেন, শোনার মধ্যে মজ্জল নেই। মানুষের কানে ভালো ও খারাপ দু রকম শব্দই ধরা পড়ে। সুখকর শব্দও কানে আসে, আবার কর্কশ শব্দও আসে। কাজেই শোনার মধ্যে মজ্জল নিহিত নেই। আমার মতে ঘ্রাণ নেওয়ার মধ্যে মজ্জল আছে। স্বাদ নেওয়ার মধ্যে মজ্জল আছে। আর আছে স্পর্শ করার মধ্যে। যেমন, খুব ভোরে উঠে পদ্মফুলের গন্ধ পেলে মজ্জল হয়। মাটি ছুঁয়ে দেখলে মজ্জল। হলুদ রঙের শস্য ছুঁতে পারলে মজ্জল। আবার ভেজা গোবর স্পর্শ করলে মজ্জল অনিবার্য। তাঁর কথাও কেউ কেউ বিশ্বাস করল, কেউ কেউ করল না।

এভাবে দেবতা ও মানুষের মধ্যে মজ্জল নিয়ে চিন্তায় বার বছর কেটে গেল। তখন তাবতিৎস স্বর্গের দেবতারা একত্রিত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে উপস্থিত হলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র সব শুনে একজন দেবপুত্রকে আদেশ করলেন, বৎস, তুমি মর্তলোকে ভগবান বুদ্ধের কাছে গিয়ে এ বিষয় সম্পর্কে জেনে এসো।

ইন্দ্রের আদেশ পেয়ে সেই দেবপুত্র বিদ্যুতের গতিতে ছুটলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্য দেবতারাও তাঁর পিছু নিলেন। বুদ্ধ তখন শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে ছিলেন। দেবতারা সেখানে পৌঁছে ভগবান বুদ্ধকে অভিবাদন করে মজ্জল কী তা জানতে চাইলেন।

তার উত্তরে ভগবান বুদ্ধ দেবতা ও মানুষের উপকারের জন্য আটত্রিশ প্রকার মজ্জলের কথা বললেন। এভাবে মজ্জল সূত্রের উৎপত্তির পটভূমি রচিত হল।

মজ্জল সুত্তং

১. বহু দেবা মনুসসা চ, মজ্জালানি অচিন্তয়ুং
আকঙ্কমানা সোথানং ব্রহ্মি মজ্জলমুত্তমং।
২. অসেবনা চ বালানং, পণ্ডিতানঞ্চ সেবনা,
পূজা চ পূজনীয়ানং, এতং মজ্জলমুত্তমং।
৩. পতিরূপদেসরাসো চ পুবে চ কতপুংগুতা,
অন্তসম্মগিধি চ এতং মজ্জলমুত্তমং।
৪. বাহুসচ্চঞ্চ সম্পঞ্চ বিনয়ো চ সুসিক্কিতো,
সুভাসিতা চ যা বাচা, এতং মজ্জলমুত্তমং।
৫. মাতাপিতৃ উপট্টানং, পুণ্ডদারসং সজ্জাহো,
অনাকুলা চ কম্মন্তা, এতং মজ্জলমুত্তমং।
৬. দানঞ্চ ধম্মচরিয়া চ এতানঞ্চ সজ্জাহো,
অনবজ্জানি কম্মানি, এতং মজ্জলমুত্তমং।
৭. আরতি বিরতি পাপা, মজ্জপানা চ সএংগমো,
অপ্পমাদো চ ধম্মেসু, এতং মজ্জলমুত্তমং।
৮. গারবো চ নিবাতো চ সত্তুট্টী চ কতপুংগুতা,
কালেন ধম্মসবণং এতং মজ্জলমুত্তমং।
৯. খন্তী চ সোবচসস্তা, সমণানঞ্চ দস্সনং,
কালেন ধম্মসাকচ্ছা, এতং মজ্জলমুত্তমং।
১০. তপো চ ব্রহ্মচরিয়ঞ্চ অরিয়সচ্চান দস্সনং,
নিব্বানং সচ্ছিকিরিয়া চ এতং মজ্জলমুত্তমং।
১১. ফুট্টসং লোকধম্মেহি চিত্তং যস্স ন কম্পতি,
অসোকং বিরজং থেমং, এতং মজ্জলমুত্তমং।
১২. এতাদিসানি কত্ত্বান সব্বথম্পরাজিতা,
সব্বথ সোথিং গচ্ছন্তি তং তেসং মজ্জলমুত্তমন্তি।

অনুবাদ

১. প্রভু, বহু দেবতা ও মানুষ স্বস্তি কামনা করে কিসে মজ্জল হয় তা চিন্তা করছিলেন। কিন্তু কিসে মজ্জল হয় তা কেউই সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারেননি। আপনি দয়া করে দেবতা ও মানুষের মজ্জলসমূহ ব্যক্ত করুন।
(দেবতার প্রার্থনায় ভগবান বুদ্ধ বললেন—)
২. মূর্খ লোকের সেবা না করা, জ্ঞানী লোকের সেবা করা এবং পূজনীয় ব্যক্তিগণের পূজা করা উত্তম মজ্জল।
৩. (ধর্মমত জীবনযাপনের উপযোগী) প্রতিরূপ দেশে বাস করা, পূর্বকৃত পুণ্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত থাকা ও নিজেকে সম্যক পথে পরিচালিত করা উত্তম মজ্জল।
৪. নানা শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করা, বিবিধ শিল্পশিক্ষা করা, বিনয়ী ও সুশিক্ষিত হওয়া এবং সুভাষিত বাক্য বলা উত্তম মজ্জল।
৫. মাতা ও পিতার সেবা করা, স্ত্রী ও পুত্রের উপকার করা এবং নিষ্পাপ ব্যবসা ও বাণিজ্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা উত্তম মজ্জল।
৬. দান দেওয়া, ধর্মাচরণ করা, জ্ঞাতীগণের উপকার করা এবং সন্দ্বর্মে অপ্রমত্ত থাকা উত্তম মজ্জল।
৭. কায়িক ও মানসিক পাপ কাজে অনাসক্তি, শারীরিক ও বাচনিক পাপ থেকে বিরতি, মদ্যপানে সত্ব্যম ও অপ্রমত্তভাবে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা উত্তম মজ্জল।
৮. গৌরবনীয় ব্যক্তির গৌরব করা, তাদের প্রতি বিনয় প্রদর্শন করা, প্রাপ্ত বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকা, উপকারীর উপকার স্বীকার করা ও যথাসময়ে ধর্ম শ্রবণ করা উত্তম মজ্জল।
৯. ক্ষমাশীল হওয়া, গুরুগণের আদেশ পালনে সুবাহ্য হওয়া, শ্রামণদের দর্শন করা ও যথাসময়ে ধর্ম আলোচনা করা উত্তম মজ্জল।

১০. তপস্চর্য ও ব্রহ্মচর্য পালন করা, চারি আর্ষসত্য হৃদয়জ্ঞাম করা এবং পরমপদ নির্বাণ সাক্ষাৎ করা উত্তম মজ্জল।
১১. লাভ ও অলাভ, যশ ও অযশ, নিন্দা ও প্রশংসা, সুখ ও দুঃখ এই আট প্রকার লোকধর্মে অবিচলিত থাকা, শোক না করা, লোভ, দ্বেষ, মোহের মতো কলুষতা থেকে মুক্ত থাকা এবং নিরাপদ থাকা উত্তম মজ্জল।
১২. এই সমস্ত মজ্জলকর্ম সম্পাদন করে দেবতা ও মানুষ সব বিষয়ে জয়লাভ ও সর্বত্র নিরাপদ জীবনযাপন করে, অতএব এগুলো শ্রেষ্ঠ মজ্জল বলে অনুধাবন কর।

দণ্ডবর্গগো

দণ্ডবর্গের আবেদন

‘ধর্মপদ’ সূত্র পিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ে দ্বিতীয় বই। এটি একটি সংকলন গ্রন্থ। ত্রিপিটকের বিভিন্ন স্থান থেকে ধর্মপদের গাথাগুলো সংকলিত হয়েছে। ধর্মপদের অর্থ পুণ্যের পথ, ধর্মের পথ। এতে ২৬টি অধ্যায় ও ৪২৩টি শ্লোক আছে।

দণ্ডবর্গ হল ধর্মপদের দশম অধ্যায়। দণ্ড শব্দের অর্থ শাস্তি। দণ্ডবর্গে শাস্তির কথা বলা হয়েছে। পৃথিবীতে অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য শাস্তির প্রচলন আছে। তবুও মানুষের অন্যায় করার প্রবণতা দূর হয়নি। এ জন্য ভগবান বুদ্ধ মানুষের জন্য চিরাচরিত শাস্তির কথা বলেননি। তিনি অন্যায়কারীর প্রতি শাস্তির কথা বলেছেন ঠিকই। কিন্তু অন্যায়কারীর প্রতি তিনি গভীর সহানুভূতিও প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ দণ্ডিতের সঙ্গে দণ্ডদাতার মনের বেদনার কথা বলেছেন।

দণ্ডবর্গের প্রতিটি গাথার দণ্ডদাতা ও শাস্তি ভোগকারীর কথা বলা হয়েছে। প্রাণীমাত্রই শাস্তিকে ভয় করে মৃত্যুর নামে সকলে শিউরে ওঠে। কেউ মৃত্যুদণ্ড পেলে তার মনের অবস্থা খুব শোচনীয় হয়। কারণ জীবন সবার প্রিয়। নিজেকে সবাই ভালোবাসে। এ জন্য নিজের কথা ভেবে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত নয়। কারণ যে নিজের সুখ কামনা করে অথচ পরের সুখ হরণ করে সে সুখী হতে পারে না। অন্যকে দুঃখ দিলে তার মনে প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা জাগে। আর নির্দোষ ব্যক্তিকে শাস্তি দিলে তার কষ্ট আরও বেশি হয়। ফলে দণ্ডদানকারীকেও এই পাপের ফলে মৃত্যুর পর নরকে যেতে হয়। তাকে নরকের তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

এ জন্য জ্ঞানীগণ বহু বিষয়ে চিন্তা করে অন্যায়কারীকে দণ্ড দেন। দণ্ডবর্গের শ্লোকে এসব বিষয় বুদ্ধ খুব সুন্দরভাবে বলেছেন।

পালি ও বাংলা অনুবাদ

১. সবে তসন্তি দণ্ডসু সবে ভাষন্তি মচ্ছুনো,
অন্তানং উপমং কত্তা ন হনেয্য না ঘাতবে।
বাংলা : সবাই দণ্ডকে ভয় করে, মৃত্যুর ভয়ে সবাই সঙ্কস্ত। নিজের সঙ্গে এসব বিষয়ে তুলনা করে কাউকে আঘাত কিংবা হত্যা কর না।
২. সবে তসন্তি দণ্ডসু সবে সৎ জীবিতং পিযং
অন্তানং উপমং কত্তা ন হনেয্য ন ঘাতয়ে।
বাংলা : সকলেই দণ্ডকে ভয় করে, জীবন সবার প্রিয়, সুতরাং নিজের সঙ্গে তুলনা করে কাউকে প্রহার কিংবা আঘাত কর না।
৩. সুখকামানি ভূতানি যো দণ্ডের বিহিত্তি,

অন্তনো সুখমেসনো পেচ্চ সো ন লভতে সুখং।

বাংলা : নিজের সুখের জন্য যে অপর সুখ প্রত্যাশী প্রাণীগণকে দণ্ড দেয়, পরলোকে সে কখনও সুখ লাভ করতে পারে না।

৪. সুখকামানি ভূতানি যো দণ্ডেন ন হিৎসতি,

অন্তনো সুখমেসনো পেচ্চ সো লভতে সুখং।

বাংলা : নিজের সুখের জন্য যিনি অপর সুখকামী প্রাণীগণকে দণ্ড দেন না পরলোকে তিনি নিশ্চয়ই সুখ লাভ করবেন।

৫. মা বেচ ফরুসং কঞ্চি বৃত্তা পটিবদেয়ু তং,

দুক্খা হি সারম্ভকথা পটিদন্ডা ফুসেয়ু তং।

বাংলা : কাউকে কটু কথা বলো না। যাকে কটু কথা বলবে সেও তোমাকে কটু কথা বলতে পারে।
ক্রোধপূর্ণ বাক্য দুঃখকর, সে জন্য দণ্ডের প্রতিদণ্ড তোমাকে স্পর্শ করবে।

৬. সচে নেরেসি অন্তানং কথসো উপহতো যথা, এস পত্তো'সি নিব্বানং সারম্ভো তে ন বিজ্জতি।

বাংলা : আঘাত পাওয়া কাঁসার মতো যদি নিজেকে সহনশীল রাখতে পার তবেই তুমি নির্বাণ লাভ করবে,
ক্রোধ থেকে জন্ম নেওয়া বাদবিসম্বাদ আর থাকবে না।

৭. যথা দণ্ডেন গোপালো গাবো পাচেতি গোচরং এবং জরা চ মচ্ছু চ আয়ুং পাচেস্টি পাণিনং।

বাংলা : রাখাল যেমন দণ্ডাঘাতে গরু তাড়িয়ে গোচারণভূমিতে নিয়ে যায়, সেইরূপ জরা ও মৃত্যু প্রাণীদের আয়ু তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

৮. অথ পাপানি কম্মানি করং বালো ন বুজ্জতি,

সেহি কম্মেহি দুম্মেধো অগ্গিদট্টো'ব তপ্পতি।

বাংলা : নির্বোধ লোক পাপ কাজ করার সময় তার ফল সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে, সুতরাং দুষ্ক লোক নিজের কর্মের দ্বারা আগুনে পুড়ে যাওয়ার যন্ত্রণা ভোগ করে।

৯. যো দণ্ডেন অদণ্ডেসু অপ্পদুট্টেসু দুসসতি,

দসন্নমএত্তরং ঠানং খিপ্পমেব নিগচ্ছতি।

১০. বেদনং ফরুসং জানিৎ সরীরস্ চ ভেদনং,

গরুকং বা'পি আবাসং চিত্তক্ষেপং'ব পাপুণে।

১১. রাজতো বা উপসগ্গং অব্ভক্খানং'ব দারুণং

পরিক্খয়ং'ব এত্তীনিং ভোগানং'ব পত্তজ্জুনং।

১২. অথ'বস্ অগারানি অগগি ডহতি পাবকো,

কায়স্ ভেদা দুপ্পএত্তে নিরয়ং সো'পাপজ্জতি।

বাংলা : অদণ্ডনীয় ও নিরপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করে যে লোক দণ্ডবিধান করে সেই লোক ইহজন্মে দশ দশার এক দশা ভোগ করে।

তীব্র দুঃখ, ক্ষতরোগ, কঠিন রোগ, চিকিৎসিকার বা পাগল হওয়া এবং রাজদণ্ড ভোগ করতে হয় তাকে। আর জ্ঞাতির মৃত্যু, অপবাদ, অজ্ঞাহনি বা অর্থ নষ্ট হতে পারে এবং আগুনে তার ঘর পুড়ে যেতে পারে।

এই দশ রকম দুঃখের যে কোনো দুঃখ এসব জ্ঞানহীন লোক এই জন্মে ভোগ করবে এবং মৃত্যুর পর নরকে জন্ম নেবে।

১৩. ন নগ্গচরিয়্যা ন জট্টা ন পজ্জকা
নানাসকা থণ্ডিল সাযিকা বা,
রজ্জো চ জল্লং উক্কুটিকপ্পধানং
সোধেত্তি মচ্চং অবিতিল্লকঙ্খং।

বাংলা : নগ্ন থাকা, জট্টাধারণ, কাদালেপন, অনশন, যজ্ঞভূমিতে শয়ন, ধূলি বা ছাই মাখা, কঠিন উৎকট তপস্যায় নিজেকে পীড়ন করা, এসব জপতপ কিছুতেই সংশয়ভরা মানুষকে পবিত্র করতে পারে না।

১৪. অলঙ্কতো চেপি সমং চরৈয়্য
সন্তো দন্তো নিয়তো ব্রহ্মচারী,
সবেবসু ভূতেসু নিধায় দণ্ডং,
সো ব্রাহ্মণো সো সমনো স ভিক্ষু।

বাংলা : অলঙ্কৃত হয়েও যিনি শান্ত, দমিত ও সব সময় ব্রহ্মচারী, যিনি সকল প্রাণীর প্রতি হিংসাহীন হয়ে শান্তিময় আচরণ করেন তিনি ব্রাহ্মণ, তিনিই শ্রামণ এবং তিনিই ভিক্ষু।

১৫. হিরীনিসেধো পুরিসো কোচি লোকসুমিং বিজ্জতি,
যো নিন্দং অপ্পবোধতি অস্সো ভদ্রো কসামিব।

বাংলা : সুশিক্ষিত ঘোড়া যেমন বেতের আঘাতকে ঘৃণা করে, সেইরূপ (যিনি) নিন্দাকে অবজ্ঞা করেন এবং (যিনি) লজ্জার কারণে অকুশল কাজ থেকে বিরত থাকেন এমন মহাপুরুষ জগতে বিরল।

১৬. অস্সো যথা ভদ্রো কসানিবিট্টো
আতাপিনো সৎবেগিনো ভবাথ,
সম্ভায় সীলেন চ বিরিয়েন চ
সমাধিনা ধম্মবিনিচ্ছয়েন চ;
সম্পন্ন বিজ্জাচরণা পতিস্সতা
পহস্সথ দুক্কখমিদং অনপ্পকং।

বাংলা : বেতের আঘাতে সুশিক্ষিত ভদ্র ঘোড়া যেমন বেগবান হয়, সেইরূপ তোমরা শক্তিমান ও বেগযুক্ত হও। শ্রদ্ধা, শীল, শৌর্য, সমাধি ও ধর্মজ্ঞান দ্বারা বিদ্যা ও আচরণসম্পন্ন হও, স্মৃতিমান হও। এতে তোমরা এই অপরিমেয় দুঃখরাশি পরিত্যাগ করতে সমর্থ হবে।

১৭. উদকং হিয় নয়ন্তি নেত্তিকা
উসুকারা নমযন্তি তেজ্জনং,
দারুং নমযন্তি তচ্ছকা
অন্তানং দমযন্তি সুব্বতা।

বাংলা : সেচবিশারদ যেমন জলকে ইচ্ছামতো চালিত করেন, শর-নির্মাতা যেমন শরের ঋজুতা সাধন করেন, ছুতোর বা কাঠমিস্ত্রি যেমন কাঠের টুকরাকে ইচ্ছামতো আকার দান করেন, ব্রতচারী লোকও তেমনি নিজেকে দমন করতে পারেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদের আলোকে ১, ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

সবিতা তালুকদার বৌদ্ধধর্ম শিক্ষার ক্লাসের পাঠ গ্রহণ থেকে জানতে পেরেছে প্রকৃত মজ্জল কী এ বিষয়টি জানার জন্য দেবতা ও মানুষের বার বছর কেটে গেছে। অবশেষে ভগবান আটত্রিশ প্রকার উত্তম মজ্জলের কথা জানানেন। ভালো কিছু দেখা, শোনা, ঘ্রাণ নেওয়া মজ্জল নয়। সবিতা তালুকদার দম্ভবগ্গের গাথায় অযথা শাস্তি দিলে কী অকল্যাণ হয় তাও জানতে পারল।

১. মজ্জল সূত্রের বর্ণিত মজ্জল বলতে কী বোঝায়?

- | | |
|-------------------------------|--|
| ক. ভালো কিছু দেখলে মজ্জল হয় | খ. দেখার মধ্যে নয় শোনার মধ্যেই মজ্জল |
| গ. ঘ্রাণ নেওয়ার মধ্যেই মজ্জল | ঘ. বুদ্ধ দেশিত ৩৮ প্রকার মজ্জলই প্রকৃত মজ্জল |

২. অযথা বিনা কারণে কোনো ব্যক্তিকে দণ্ড বা শাস্তি বিধান করলে কী হবে?

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| ক. আইনে যা সিদ্ধান্ত হয় | খ. কর্মফল অনিবার্য |
| গ. মৃত্যুর পর নরকে যেতে হবে | ঘ. অসীম ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায় |

৩. দণ্ড শব্দের অর্থ-

- | | |
|---------------------|----------------|
| ক. শাস্তি পাওয়া | খ. নরক গমন |
| গ. সহানুভূতি প্রকাশ | ঘ. কষ্ট পাওয়া |

৪. ক্রোধপূর্ণ বাক্য-

- | | |
|----------------------|------------------|
| ক. কাঁসার আঘাতের মতো | খ. দুঃখকর |
| গ. মৃত্যুর মতো | ঘ. যন্ত্রণাদায়ক |

সৃজনশীল প্রশ্ন

শিক্ষার্থী আনন্দ বড়ুয়া চতুর্থ অধ্যায়ে সূত্র ও নীতিগাথার গুরুত্ব সম্পর্কে জেনেছিল। এ সম্পর্কে বিভিন্ন জনের মন্তব্যও সে জানে। গৌতম বুদ্ধের দেশনায় যে আটত্রিশটি মজ্জলের কথা বলা হয়েছে তাতে সে প্রকৃত মজ্জল অনুধাবন করেছিল। এছাড়া দম্ভবগ্গো এর নীতি গাথায় কটুকথায় দুঃখজনক অপকারিতা জেনে সে সহপাঠী বন্ধুকে অভ্যাস পরিবর্তনের জন্য বুঝিয়ে বলে।

- | |
|---|
| ক. মজ্জল শব্দের অর্থ বলতে কী বুঝায়? |
| খ. উত্তম মজ্জল সম্পর্কিত মজ্জল সূত্রের একটি শ্লোক ব্যাখ্যা কর। |
| গ. একজন কটুকথা বলতে অভ্যস্ত বন্ধু কীভাবে তার অভ্যাস পরিবর্তন করতে পারে? সংক্ষেপে লিখ। |
| ঘ. কটুকথার পরিবর্তে সুন্দরভাবে কথা বলায় কী লাভ হয়- ব্যাখ্যা কর। |

পঞ্চম অধ্যায়

চতুরার্যসত্য

জগৎ দুঃখময়, জীবন দুঃখময়। সংসার জীবন এক দুঃখের সমুদ্র। আমরা এই দুঃখের সমুদ্রে নিয়ত ভেসে চলেছি। কেউ কেউ মনে করেন সংসারে সুখ আছে। সুখ না থাকলে মানুষ বাঁচতে পারত না। এই সুখ ক্ষণস্থায়ী। এখন আছে, এখন নেই। আজ আছে কাল নেই। তবুও সুখ আছে, তবে এই সুখ প্রকৃত সুখ নয়। এই সুখের আড়ালে রয়েছে দুঃখ। সুখের আমেজ মিলিয়ে যাবার সাথে সাথেই দুঃখ এসে সামনে দাঁড়ায়। শুরু হয় দুঃখের জ্বালা। তাই ক্ষণস্থায়ী সুখের পরিণাম দুঃখজনক। তাহলে দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় কী?

আজ থেকে আড়াই হাজার বছরেরও আগের কথা। দীর্ঘ সাধনা ও ত্যাগ— তিতিক্ষার পর বুদ্ধ এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছেন। তিনি বললেন, দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় চতুরার্যসত্য।

চতুরার্যসত্য কী কী?

১. দুঃখ আর্যসত্য
২. দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য
৩. দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য
৪. দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য।

তথাগত বুদ্ধ চতুরার্যসত্য বলতে চারটি আর্যসত্যের উল্লেখ করেছিলেন। এখন আমরা এই চতুরার্যসত্য সম্পর্কে আলোচনা করব।

দুঃখ আর্যসত্য

মানব জীবন দুঃখময়। অনেকে বলবেন একথা সত্য নয়। সংসার যদি দুঃখময়ই হয় তাহলে এত হাসি, আনন্দ, উল্লাস, স্নেহ, প্রীতি, ভালোবাসা— এসব কি সুখ নয়? না, এই সুখ প্রকৃত সুখ নয়। এ সবই মায়া। আমরা মায়ার বন্দনে আবদ্ধ। আমরা মোহাচ্ছন্ন। আমরা আসলে বুঝতে পারি না যে সুখের আড়ালে রয়েছে দুঃখ। সেই দুঃখ যখন আড়াল থেকে উঁকি মারে তখনও আমরা দুঃখকে চিনতে পারি না। এর কারণ অজ্ঞানতা। অজ্ঞানতার কারণেই আমরা দুঃখ ঠিকমতো চিহ্নিত করতে পারি না। তাহলে দুঃখ কী?

দুঃখ নানা প্রকার। যেমন—

জন্ম দুঃখ

জরা দুঃখ

ব্যাধি দুঃখ

মৃত্যু দুঃখ

প্রিয় বিয়োগ দুঃখ

অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ

যা চাই তা না পাওয়ার দুঃখ

শোক—পরিতাপ ইত্যাদি দুঃখ।

পৃথিবীতে জন্ম নিলেই মানুষের রোগব্যাধি হবে। বুড়ো হতে হবে। দেহ মলিন হবে চামড়া কুঁচকে যাবে। চুল পেকে যাবে। দাঁত পড়ে যাবে। চলতে ফিরতে কষ্ট হবে। শেষে একদিন মৃত্যু এসে গ্রাস করবে। একজনের মৃত্যুতে অন্যজন শোক করবে। তাই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সবই দুঃখ। এছাড়া জীবনে আরও অনেক রকম দুঃখ আছে। এ দুঃখ সব সময় আমাদের ছায়ার মতো অনুসরণ করে। তাই এসব দুঃখকে দুঃখ আর্ষসত্য বলা হয়।

দুঃখ সমুদয় আর্ষসত্য

কারণ ছাড়া কোনো কিছুর উৎপত্তি সম্ভব নয়। দুঃখ উৎপত্তিরও কারণ আছে। জন্মের পর থেকেই মানুষ দুঃখ ভোগ করতে থাকে। তাহলে মানুষ জন্ম নেয় কেন? জন্মের কারণ তৃষ্ণা। আর এই তৃষ্ণার কারণ অজ্ঞানতা। অজ্ঞানতার কারণে আমরা অসত্যকে সত্য, সত্যকে অসত্য মনে করি। ফলে পৃথিবীর রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদিতে আমরা আকৃষ্ট হই। এসব পাওয়ার জন্য আমাদের তীব্র বাসনা জাগে। এ বাসনার কারণেই আমরা বারবার পৃথিবীতে জন্ম নিই। তাই এ বাসনা বা তৃষ্ণাই দুঃখ সমুদয় আর্ষসত্য।

দুঃখ নিরোধ আর্ষসত্য

তৃষ্ণার কারণে মানুষ বারবার জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং তৃষ্ণাকে দমন করতে হবে। তৃষ্ণাকে বিনাশ করতে হবে। তৃষ্ণা নিরোধ হলেই মানুষ পুনর্জন্মের দুঃখ থেকে মুক্ত হয়। তাই তৃষ্ণার বিনাশই দুঃখ নিরোধ আর্ষসত্য।

দুঃখ নিরোধের উপায় আর্ষসত্য

মানুষের রোগ হলে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকে। সমস্যা দেখা দিলে সমাধানের উপায় থাকে। তেমনি তৃষ্ণাকে ধ্বংস করারও উপায় আছে। এই উপায়ের নাম আর্ষ অষ্টাঙ্গিক মার্গ। তাই আর্ষ অষ্টাঙ্গিক মার্গই দুঃখ নিরোধের উপায় আর্ষসত্য।

আর্ষ অষ্টাঙ্গিক মার্গ নিম্নরূপ

১. সম্যক দৃষ্টি
২. সম্যক সংকল্প
৩. সম্যক বাক্য
৪. সম্যক কর্ম
৫. সম্যক জীবিকা
৬. সম্যক ব্যায়াম
৭. সম্যক স্মৃতি
৮. সম্যক সমাধি

চতুরার্যসত্য পড়ে আমরা কী বুঝলাম? বুঝলাম, পৃথিবীতে জন্মই দুঃখ। যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ দুঃখের সাগরে আমরা ভেসে থাকি। তাহলে মৃত্যুর পর কি দুঃখের শেষ? না, শেষ হয় না। কারণ মৃত্যুতেও তৃষ্ণার বিলুপ্তি ঘটে না। মৃত্যুর পর তৃষ্ণা মানুষের সঙ্গে সঙ্গে গমন করে। এই তৃষ্ণার কারণেই মানুষকে বারবার জন্ম নিতে হয়। তাহলে এর শেষ কোথায়? তৃষ্ণার বিনাশই এর শেষ। তৃষ্ণার বিনাশ হলেই নির্বাণ লাভ সম্ভব। নির্বাণ বৌদ্ধ ধর্মের মূল লক্ষ্য। নির্বাণ পেতে হলে চতুরার্যসত্য সঠিক অনুশীলন করতে হবে। এটি সঠিক অনুশীলন করলে নির্বাণ লাভ সম্ভব হবে। তাই চতুরার্যসত্যই বৌদ্ধ ধর্মের মূল ভিত্তি।

চতুরার্যসত্য বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তি কেবল এটুকু জানলেই হবে না। চতুরার্যসত্যের মর্ম উপলব্ধি করতে হবে। এর জন্য সাধনা প্রয়োজন। প্রকৃত সাধনা কোনোদিন ব্যর্থ হয় না। সাধনার ফল ইহজন্মে, পরজন্মে অথবা জন্মজন্মান্তরে হলেও পাওয়া যায়। সাধনার উপায় আর্ষ অষ্টাঙ্গিক মার্গে বলা হয়েছে। মার্গ শব্দের অর্থ পথ। অর্থাৎ এই আটটি উপায় বা পথ অবলম্বন করেই আমরা দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করতে পারি।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১ ও ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

কিশোর চাকমা চতুরার্যসত্য অংশটি পড়ে জানল জগৎ দুঃখময়, জীবন দুঃখময়। দীর্ঘ সাধনা ও ত্যাগ তিতিক্ষায় বুদ্ধ উত্তর খুঁজে পেলেন দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় চতুরার্যসত্য। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ দুঃখ নিরোধের উপায়। কিশোর চাকমা বুঝতে পারল আটটি পথ বা মার্গ অবলম্বন করে মুক্তিলাভ করা যায়।

১. কিশোর চাকমা চতুরার্যসত্য অধ্যায়টি পড়ে কী বুঝতে পারল?

- | | |
|------------------------------|--|
| ক. পৃথিবী অতি সুখময়। | খ. জগৎ লোভ লালসায় পূর্ণ |
| গ. জগৎ দুঃখময়, জীবন দুঃখময় | ঘ. তৃষ্ণার কারণে মানুষ বারবার জন্মগ্রহণ করে। |

২. দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় বা করণীয় হল-

- আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুশীলন
- দেবতাদের পূজা করা
- অর্থ উপার্জন করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-----------|--------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. iii |

৩. দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য হল-

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| ক. বারবার জন্ম নেওয়া | খ. বাসনা বা তৃষ্ণা |
| গ. সত্যকে অসত্য মনে করা | ঘ. দেহ মলিন হওয়া |

৪. বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তি-

- | | |
|------------------|------------------|
| ক. চতুরার্যসত্য | খ. মার্গ ফল |
| গ. দুঃখীজনে দয়া | ঘ. তৃষ্ণার বিনাশ |

সৃজনশীল প্রশ্ন

বোধিজ্ঞান ভাবনা কেন্দ্রের পরিচালক জিনরক্ষিত থের ভাবনাকারীদের উদ্দেশ্যে চতুরার্যসত্য সম্পর্কে দেশনা করছিলেন। দেশনায় বলেন চতুরার্যসত্যের শেষ সত্য হল আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। একমাত্র এই মার্গ অনুসরণ করেই সকল দুঃখের অবসান ঘটিয়ে নির্বাণ লাভ করা যায়। প্রসঙ্গত তিনি বলেন, এই সুখ প্রকৃত সুখ নয় কেবল নির্বাণ লাভের মাধ্যমে প্রকৃত সুখ পাওয়া যায়।

- চতুরার্যসত্য কী ?
- দুঃখ আর্যসত্য বর্ণনা কর।
- নির্বাণ লাভের উপায় আলোচনা কর।
- ‘এই সুখ প্রকৃত সুখ নয়’-এ উক্তিটি সংক্ষেপে বুঝিয়ে লিখ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধর্মীয় অনুষ্ঠান

বৌদ্ধদের কাছে প্রত্যেকটি দিনই শুভদিন। কোনো দিন অশুভ বলে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ নেই। এমনকি শুভক্ষণ বা শুভ মুহূর্ত বলেও কিছু নেই। এমন কোনো সময় নেই, যে সময় ভালো কাজ করলে কোনো ফল পাওয়া যায় না। ভালো কাজ করলে ফল অবশ্যই পাওয়া যাবে। এ জন্য যে কোনো দিন ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন করা যায়। তবে বৌদ্ধদের মধ্যে কতকগুলো বিশেষ দিন আছে। এসব দিনে শুভ কাজ বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন করা প্রত্যেক বৌদ্ধের কর্তব্য। পবিত্র মন নিয়ে এসব দিনে ধর্মীয় কাজ করা তোমাদেরও উচিত। এতে মনের প্রসন্নতা বাড়ে। চিন্তা শূন্য হয়। সৎ কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। পরিণামে জীবনে সুখ ও শান্তি নেমে আসে। সমাজ ও রাষ্ট্রের অগ্রগতি সাধিত হয়। তোমরা এরূপ চিন্তা করে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেবে।

বৌদ্ধগণ কোনো একটি বিশেষ দিনকে উপলক্ষ করে উৎসব সম্পাদন করে থাকে। বৌদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো প্রধানত পূর্ণিমাকেন্দ্রিক। প্রত্যেক পূর্ণিমায় গৌতম বুদ্ধের জীবনের কোনো না কোনো স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছে। এই স্মরণীয় ঘটনাগুলো মনে করে প্রত্যেক পূর্ণিমাতে একই রকম ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। যুগ যুগ ধরে এই ধর্মীয় আচার ও অনুষ্ঠানগুলো বৌদ্ধরা পালন করে আসছে। এভাবে প্রত্যেক পূর্ণিমায় বৌদ্ধ নরনারী সকাল থেকেই বিহারে গিয়ে বুদ্ধ পূজা করে। শীল বা উপোসথ গ্রহণ করে। বিকালে ভিক্ষুদের কাছ থেকে ধর্মকথা শোনে। সন্ধ্যার সময় প্রদীপ পূজা করে এবং বুদ্ধকীর্তন শোনে। তারপর প্রফুল্ল চিন্তে ঘরে ফিরে আসে।

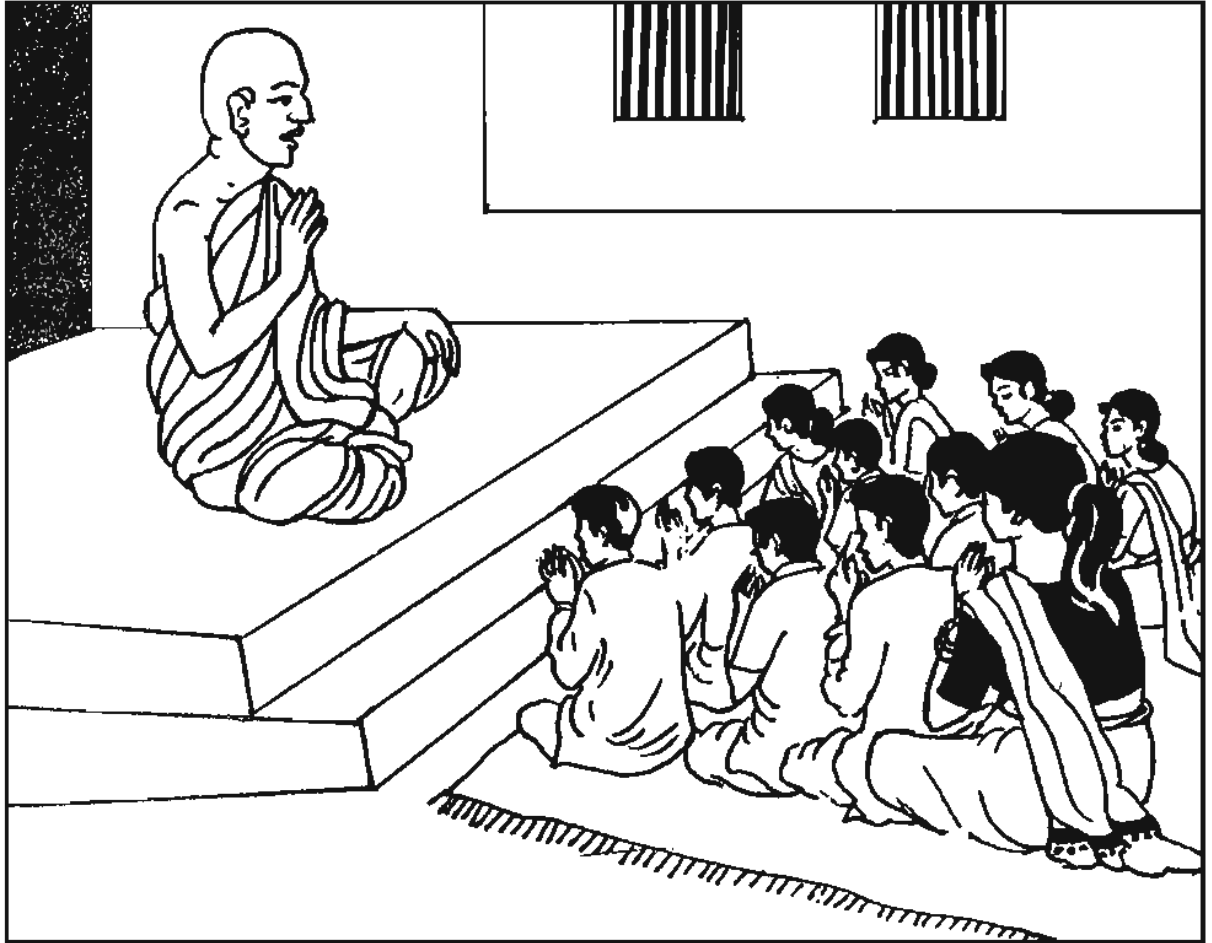
পূর্ণিমার অনুষ্ঠানগুলো সমগ্র বৌদ্ধজগতে পালিত হয়। অনুষ্ঠান হয় নির্দিষ্ট সময়ে। যেমন : পুষ্প পূজা ও বুদ্ধ পূজা হয় দিনের প্রথম ভাগে। কারণ, বৌদ্ধ ভিক্ষুরা দুপুর ১২টার আগে বুদ্ধ পূজা ও আহারের কাজ শেষ করেন। বিকালে ধর্মসভা বা ধর্মকথার আলোচনা হয়। পূর্ণিমাকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানগুলো বিশ্বজনীন অনুষ্ঠান বলা যায়। যেমন : বুদ্ধ পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, ভাদ্র পূর্ণিমা বা মধু পূর্ণিমা, প্রবারণা পূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা, ফাল্গুনী পূর্ণিমা ইত্যাদি।

আবার কতকগুলো উৎসব বা অনুষ্ঠান আছে যেগুলো পূর্ণিমাকেন্দ্রিক নয়। যেমন কঠিন চীবর দান, অষ্টপরিষ্কার দান, সজ্ঞদান, বোধিবৃক্ষ রোপণ ও উৎসর্গ অনুষ্ঠান প্রভৃতি। আবার কতকগুলো উৎসব হয় পরিবারকে কেন্দ্র করে। যেমন, শ্রামণের প্রব্রজ্যা, মৃতদেহ সৎকার এবং সে উপলক্ষে ধর্মীয় অনুষ্ঠান। পূর্বপুরুষদের জন্য বাৎসরিক ও তিথির সজ্ঞদান বা সাধারণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানও এ পর্যায়ে পড়ে। এসব পারিবারিক অনুষ্ঠানে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও এলাকার লোকজন অংশগ্রহণ করে থাকে।

এসব সমবেত ও পারিবারিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বৌদ্ধরা দানধর্ম করে। অতিথিকে আপ্যায়ন করে। ভিক্ষু ও শ্রামণদের আমন্ত্রণ জানিয়ে দান করে ও ধর্মকথা শ্রবণ করে। এ ছাড়া, চৈত্র সংক্রান্তি ও নববর্ষ উৎসব, বিবাহ, গৃহপ্রবেশ এবং অন্ত্রপ্রাশনেও বৌদ্ধরা ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে থাকে। চৈত্র সংক্রান্তি ও নববর্ষ উৎসব বৌদ্ধদের একটি বড় সামাজিক উৎসব। এই অনুষ্ঠানের দিনও বৌদ্ধরা বিহারে গিয়ে বুদ্ধ পূজা করে থাকে। এটি বৌদ্ধদের সবচেয়ে বড় সামাজিক উৎসব।

বুদ্ধ পূর্ণিমা বা বৈশাখী পূর্ণিমা

বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে গৌতম বুদ্ধের জীবনের তিনটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল। এই দিন বোধিসত্ত্বের শাক্য বংশে শেষ জন্ম হয়। বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষের নিচে বসে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন। আবার এই বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতেই আশি বছর বয়সে তিনি কুশীনগরে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। এই তিন পুণ্যস্মৃতি বিজ্ঞপ্তি পূর্ণিমা বৌদ্ধদের নিকট ‘বুদ্ধ পূর্ণিমা’ নামে খ্যাত। এ জন্য বুদ্ধ পূর্ণিমা বৌদ্ধদের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব রূপে পরিচিত। এই পুণ্যতিথিতে বৌদ্ধরা সারাদিন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নিয়োজিত থাকে।



বিহারের উপাসনারত উপাসক উপাসিকা

দিনটি শুরু হয় প্রভাতফেরির মাধ্যমে। তারপর সূর্য ওঠার সময় হয় পুষ্প পূজা। বুদ্ধ পূজা ও ভিক্ষুদের পিণ্ডদান হয় দুপুর বারটার আগে। বিকালে ধর্মসভা হয়। ধর্মসভায় গৌতম বুদ্ধের জীবন, ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে আলোচনা হয়। সম্মুখ্য প্রদীপ পূজা ও বুদ্ধকীর্তন হয়। কখনও কখনও সারা রাত বুদ্ধকীর্তন বা ধর্মীয় নাটকের অনুষ্ঠান চলে। প্রত্যেক বৌদ্ধ গ্রামে এই পুণ্যতিথি বিশেষ সমারোহের সাথে পালিত হয়।

বুদ্ধের জীবনের প্রধান তিনটি ঘটনা ঘটেছিল রাজপ্রাসাদের বাইরে। প্রকৃতির মনোরম পরিবেশে, খোলা আকাশের নিচে। জন্ম লুম্বিনী কাননে, বুদ্ধত্ব লাভ গয়ায় বোধিবৃক্ষ তলে, পরিনির্বাণ মল্লদের জোড়া শালগাছের নিচে। এমন ঘটনা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে এই পূর্ণিমা ‘পবিত্র বৈশাখ’ নামে পরিচিত। বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে চট্টগ্রামের বৈদ্যপাড়ায় বোধিদ্রুম মেলা হয়।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা

এই শুভ পূর্ণিমায় রানী মায়াদেবী একটি অপরূপ স্বপ্ন দেখেন। ওই স্বপ্নের মধ্যে বোধিসত্ত্ব মায়াদেবীর জঠরে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন। আবার এই পূর্ণিমায় গৌতম সত্য অন্বেষণে গৃহত্যাগ করেন। গৌতমের বয়স তখন ঊনত্রিশ বছর। রাজত্ব ও স্ত্রী পুত্রের মায়া ত্যাগ করে তিনি রাজবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। বুদ্ধত্ব লাভ করে সারনাথে প্রথম ‘ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র’ দেশনা করেন এই পূর্ণিমা তিথিতে। এই ত্রিস্মৃতি বিজড়িত আষাঢ়ী পূর্ণিমা বৌদ্ধদের কাছে বিশেষ পবিত্র।

এই পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য বর্ষাবাসের নিয়ম প্রবর্তন করেন। এছাড়া পরলোকগতা মা মায়াদেবীকে ধর্ম-দেশনার জন্য বুদ্ধ তাবতিংস স্বর্গে গমন করেন।

সকল পূর্ণিমার মতো এই পূর্ণিমার উৎসবও শুরু হয় সকাল থেকে। সারাদিন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পর সন্ধ্যায় শেষে উৎসবের সমাপ্তি হয়। উপাসক ও উপাসিকারা অষ্টশীল পালন করেন। পূর্ণিমার পর দিন থেকে ভিক্ষুরা তিন মাস বর্ষাবাস করেন। বর্ষাবাসের সময় ভিক্ষুরা তাঁদের নিজ নিজ বিহারে অবস্থান করে ধ্যান-সাধনা করেন। জ্ঞানের চর্চা করেন। বিনয়সম্মত কারণ ছাড়া তাঁরা এই তিন মাস নিজ বিহারের বাইরে অন্য কোথাও রাত কাটাতে পারেন না।

উপাসক ও উপাসিকারা এই তিন মাস নিয়মিত বিহারে গিয়ে ধর্মকথা শ্রবণ করেন। এতে তাঁদের মধ্যে ধর্মভাব বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া প্রতিদিন একসাথে ধর্মশ্রবণ ও ধর্মসাধনা করেন বলে তাঁদের মধ্যে মৈত্রীভাব গভীর হয়।

এ পূর্ণিমা থেকে বৌদ্ধরা সন্ধ্যায় আকাশ-প্রদীপ জ্বালায়। আকাশ-প্রদীপ তিন মাস জ্বালানো হয় এবং প্রবারণা পূর্ণিমায় এর সমাপ্তি টানা হয়। গৃহত্যাগের দিন সিদ্ধার্থ অনোমা নদীর তীরে নিজের চুল কেটে আকাশে উড়িয়ে দেন। দেবতারা সেই চুল স্বর্গে নিয়ে চৈত্য তৈরি করেন। আকাশ-প্রদীপ তারই স্মরণে জ্বালানো হয়।

মধু পূর্ণিমা

বুদ্ধ তখন কৌশাম্বীতে অবস্থান করছিলেন। সে সময় ভিক্ষুদের মধ্যে বিনয়সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে কলহ ও বিবাদ উপস্থিত হয়। এই কলহ আস্তে আস্তে ভিক্ষুদের মধ্যে আরও বেড়ে যায় এবং ছড়িয়ে পড়ে। বুদ্ধ তাঁদের কলহ ও বিবাদ করা অনুচিত বলে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁরা নিরস্ত হলেন না। বুদ্ধ তাঁদের দীর্ঘায়ুর কাহিনী বলেও থামাতে পারলেন না।

তারপর বুদ্ধ এক সময় পারলোয়ক বনে নির্জনে থাকার জন্য চলে গেলেন। ভিক্ষুদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে বুদ্ধ সেখানে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করতে লাগলেন। এ সময় সেখানে এক হস্তীরাজ অন্যান্য হাতির অত্যাচারে দিশেহারা হয়ে বাস করছিল। বুদ্ধ তখন বনের মধ্যে একটি ভদ্রশাল গাছের নিচে আশ্রয় নিয়েছিলেন। হাতিটি সেখানে পৌঁছে স্থানটি

বুদ্ধের জন্য শাঁড় দিয়ে পরিষ্কার করে দেয়। তারপর বুদ্ধের জন্য পানীয়জল সঞ্ছহ করে রাখে। হাতির সেবা দেখে বানর রাজাও বুদ্ধের জন্য মৌচাক থেকে মধু সঞ্ছহ করে দান করে।

ভাদ্র মাসের এই পূর্ণিমা এ জন্য বৌদ্ধদের কাছে মধু পূর্ণিমা নামে পরিচিত। এই দিন বৌদ্ধরা অন্যান্য পূর্ণিমার মতো সব অনুষ্ঠান করে। বিকালে মধুদান উৎসব পালন করে। মধু মানুষের শরীরের জন্য উপকারী। উপকারী দ্রব্য দান করা উত্তম কাজ। দান করার ফলে মানুষের মনের প্রসারতা বৃদ্ধি পায়। এ সময় মধু দান করলে অশেষ পুণ্য হয়। পুণ্যের ফলে মানুষ উন্নততর জীবন লাভ করে।

প্রবারণা পূর্ণিমা

এই পূর্ণিমা আশ্বিন মাসে অনুষ্ঠিত হয়। আশ্বিনী পূর্ণিমাকে প্রবারণা পূর্ণিমা বলে। আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে প্রবারণা পূর্ণিমা পর্যন্ত তিন মাস সময় ভিক্ষুদের বর্ষাবাস। এই পূর্ণিমায় ভিক্ষুদের বর্ষাবাস সমাপ্ত হয়। গৌতম বুদ্ধ তাঁর শিষ্য ভিক্ষুদের প্রবারণা পূর্ণিমার পর ধর্ম প্রচারের জন্য বিভিন্ন দিকে যেতে আদেশ প্রদান করেন।

বুদ্ধত্ব লাভের পর গৌতম সপ্তম বর্ষাবাস করেন তাবতিংস স্বর্গে। স্বর্গে তিনি মা মায়াদেবীর নিকট ধর্ম প্রচার করেন। এই তিন মাস তিনি মায়াদেবী ও দেবতার নিকট অভিধর্ম ব্যাখ্যা করেন। এই প্রবারণা পূর্ণিমার রাতে তিনি তাবতিংস স্বর্গ থেকে সাংকাশ্য নগরে অবতরণ করেন। এ সময় তিনি শিষ্যদের বিভিন্ন ঋদ্ধি প্রদর্শন করেন। এ জন্য বৌদ্ধদের কাছে এই পূর্ণিমা অত্যন্ত পবিত্র। পূর্ণিমার পরদিন থেকে শুভ কঠিন চীবর দান আরম্ভ হয়। দীর্ঘ এক মাস ধরে বিভিন্ন বিহারে এই কঠিন চীবর দানোৎসব পালিত হয়। অন্যান্য পূর্ণিমার মতো এই দিনেও প্রভাতফেরি, ধর্ম আলোচনা, প্রদীপ পূজা ইত্যাদি অনুষ্ঠান হয়। সম্ম্যায় রঙিন কাগজ দিয়ে ফানুস তৈরি করে আকাশে উড়িয়ে দেওয়া হয়।

মাঘী পূর্ণিমা

মাঘী পূর্ণিমার সময় বুদ্ধ বৈশালী নগরীর চাপাল চৈত্রে অবস্থান করছিলেন। এই দিন তিনি সেখানে ঘোষণা করেন যে তিন মাস পর বৈশাখী পূর্ণিমায় তিনি পরিনির্বাণ দিন ঘোষণা করে আয়ু সঙ্স্কার বিসর্জন দেন। এজন্য এই দিনটি বৌদ্ধদের কাছে শোকজন। পূর্ণিমা মাত্রই বৌদ্ধদের কাছে পবিত্র। মাঘী পূর্ণিমার দিনও বৌদ্ধরা মন্দিরে সমবেত হয়। দুঃখের অবসান কামনায় পুণ্যকর্ম করে। বয়স্ক ব্যক্তির অষ্টশীল গ্রহণ করেন। এই দিন আমরা ভালো কাজ করি। বুদ্ধকে শ্রদ্ধা জানাই। ভিক্ষুদের বন্দনা করি। গুরুজনদের শ্রদ্ধা জানাই। অন্যান্য পূর্ণিমার মতো এই দিন ভোরে প্রভাতফেরি ও পুষ্প পূজা হয়। তারপর বন্ধু পূজা ও ভিক্ষুদের পিণ্ডদান করা হয়।

অন্যান্য পূর্ণিমার মতো এই দিন ভোরে প্রভাতফেরি ও পুষ্প পূজা হয়। তারপর বুদ্ধ ও ভিক্ষুদের পিণ্ডদান করা হয়। দুপুরে ভিক্ষুর উপাসক-উপাসিকাদের ধর্মকথা বলেন। সম্ম্যায় প্রদীপ পূজা ও বুদ্ধকীর্তন হয়।

এই পূর্ণিমায় চট্টগ্রামের নানা স্থানে মেলা হয়। ঠেগরপুনিতে বুড়াগোসাঁই মেলা, রাউজান শায়িত বুদ্ধ মেলা, বীনাঙ্গুরিতে পরিনির্বাণ মেলা, লাঠিছড়িতে বুদ্ধমেলা এবং আবদুল্লাপুরে শাক্যমুনি মেলা উল্লেখযোগ্য।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১, ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

বৈশাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে বরইগাঁও কনকচৈত্য বিহারে ধর্মীয় সভার আয়োজন করা হয়। বিদর্শনাচার্য বাবু তেমিয়ব্রথ বড়ুয়া ধর্মদেশনা করেন। তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং বৈশাখী পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, প্রবারণা ও মাঘী পূর্ণিমা উদযাপনের নিয়ম কানুনের ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দেন।

১. আমরা মাঘী পূর্ণিমা উদযাপন করে থাকি, কেননা-

- এই দিনে বুদ্ধ আয়ু সংস্কার বিসর্জন করেন
- এই দিনে বুদ্ধ মাতৃ জঠরে প্রতিসম্মি গ্রহণ করেন
- এই দিনে বুদ্ধকে বানর রাজ সেবা করেন

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-----------|------------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. i, ii এবং iii |

২. বৈশাখী পূর্ণিমাতে তোমরা কী করবে?

- | | |
|---------------|-------------------|
| ক. বুদ্ধ পূজা | খ. ধর্ম পূজা |
| গ. সংঘ পূজা | ঘ. ত্রিপুরার পূজা |

৩. বর্ষাবাসের সময় তুমি কী করবে?

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| ক. বিহারে গিয়ে ধর্ম কথা শুনবে | খ. বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে যাবে |
| গ. বিদেশ ভ্রমণে বের হবে | ঘ. নিজ বাড়িতে অবস্থান করবে |

৪. প্রবারণা পূর্ণিমাতে বুদ্ধ ভাববিংস স্বর্গ থেকে কোথায় অবতরণ করেন?

- | | |
|------------------|---------------|
| ক. রাজ গৃহে | খ. লুম্বিনীতে |
| গ. সাংকাশ্য নগরে | ঘ. বৈশালীতে |

৫. বোধিসত্ত্বের জন্ম কোন পূর্ণিমাতে হয়েছিল?

- | | |
|----------------------|------------------------|
| ক. বৈশাখী পূর্ণিমাতে | খ. আষাঢ়ী পূর্ণিমাতে |
| গ. মধু পূর্ণিমাতে | ঘ. প্রবারণা পূর্ণিমাতে |

৬. পূর্ণিমা উদযাপন করলে-

- চিত্ত শুদ্ধ হয় ও প্রসন্নতা বাড়ে
- চুরি করলেও পাপ হয় না
- অন্য পুণ্যানুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|------------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii এবং iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সুভদ্রা নামক ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী বৌদ্ধধর্ম ক্লাসে শিক্ষকের নিকট জানতে পারল যে, বুদ্ধ কৌশলীতে অবস্থানকালে ভিক্ষুরা বিনয় সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে পরস্পরের সাথে দ্বন্দ্ব বিরোধে লিপ্ত হয়। তখন বুদ্ধ ভিক্ষুদের বিরোধ মীমাংসা করতে না পারায় এক বনে নির্জনে থাকার জন্য চলে যান। সেখানে তিনি বন্য হস্তী ও বানর রাজার সেবা পেয়েছিলেন। এ ঘটনাটি মধু পূর্ণিমাতে সংঘটিত হয়েছিল।
 - ক. কোন পূর্ণিমাতে মধু পূর্ণিমা বলা হয়?
 - খ. নির্জন বনে হাতি কিভাবে মহামতি বুদ্ধের সেবা করেছিল?
 - গ. একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর মধু পূর্ণিমা উদযাপনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
 - ঘ. মধু পূর্ণিমা উদযাপনের মাধ্যমে যে শিক্ষা গ্রহণ করা যায়, সে সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।
২. সজল জিদানন্দ মহাথেরো মহাশয়ের কাছে ধর্মীয় অনুষ্ঠান বিষয়ক আলোচনা শুনছিল। তিনি বলেন, বৌদ্ধধর্মের প্রতিটি দিনই শুভদিন। তবে বেশিরভাগ ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো পূর্ণিমা তিথিতে হয়ে থাকে। বুদ্ধ পূর্ণিমা মহামতি বুদ্ধের জন্ম তিথি। এটি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব হিসেবে স্বীকৃত।
 - ক. কোন পূর্ণিমা তিথিতে গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন?
 - খ. বৌদ্ধধর্মে প্রতিটি দিনই শুভদিন-উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
 - গ. একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হিসাবে তুমি কিভাবে বুদ্ধ পূর্ণিমা উদযাপন কর তা সংক্ষেপে লিখ।
 - ঘ. বুদ্ধ পূর্ণিমা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব-এ সম্পর্কে তোমার মতামত ব্যক্ত কর।
৩. বুদ্ধ পূর্ণিমা সমগ্র বিশ্বের বৌদ্ধদের জন্য অত্যন্ত পবিত্র দিন। বৌদ্ধ সম্প্রদায় সারা বছর এ দিনটির জন্য অপেক্ষা করে। তারা যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী এই দিনটি উদযাপন করে। শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে মহাকাবুগিক তথাগত বুদ্ধ কপিলাবস্তু গিরিতে জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধত্ব লাভ করার দীর্ঘ ৪৫ বছর পর এ পূর্ণিমাতে কুশীনগরে জমকশাল বৃক্ষমূলে তিনি মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।
 (সূত্র : বুদ্ধ পূর্ণিমা বিশেষ সংখ্যা, প্রথম আলো ১৯শে মে, ২০০৮)
 - ক. এ পূর্ণিমা তিথিতে কয়টি ঋণীয় ঘটনা ঘটেছিল?
 - খ. এ পূর্ণিমা বৌদ্ধদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?
 - গ. এ দিনটি তুমি কিভাবে পালন করবে?
 - ঘ. শুভ বৈশাখী পূর্ণিমার বোধিজ্ঞান লাভের মাধ্যমে বুদ্ধ যে দুঃখমুক্তির উপায় আবিষ্কার করেন তা ব্যাখ্যা কর।

সপ্তম অধ্যায়

চার মহাতীর্থ

তীর্থস্থান অর্থ পবিত্রস্থান। বিভিন্ন সময়ে মহাপুরুষেরা জন্ম নিয়েছেন পৃথিবীতে। প্রচার করেছেন নিজ নিজ ধর্ম বিভিন্ন স্থানে রেখে গেছেন কর্মময় জীবনের নানা স্মৃতি। ভক্তদের কাছে এসব স্থান পরম পবিত্র তীর্থভূমি।

বৌদ্ধধর্ম খুব প্রাচীন ধর্ম। খ্রিস্টপূর্ব ৬২৩ অব্দে গৌতম বুদ্ধ বর্তমান নেপালের লুম্বিনী কাননে জন্মগ্রহণ করেন। ৩৫ বছর বয়সে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন। বুদ্ধ তারপর ৪৫ বছর ধরে প্রাচীন ভারতের বহু জায়গায় ধর্ম প্রচার করেন। যেসব স্থানে তিনি গেছেন সেসব স্থান বুদ্ধের স্মৃতি ধারণ করে বিখ্যাত হয়ে আছে। সেজন্য সেসব স্থান আজ তীর্থস্থানের মর্যাদা লাভ করেছে।

এই পবিত্র তীর্থগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—তীর্থ ও মহাতীর্থ। যেসব জায়গায় বুদ্ধের জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো সংঘটিত হয় সেগুলোকে বলা হয় মহাতীর্থ। তাঁর জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে চারটি ঘটনাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেগুলো হল— গৌতমের জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ, প্রথম ধর্ম প্রচার এবং পরিনির্বাণ। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো যথাক্রমে লুম্বিনী, বুদ্ধগয়া, সারনাথ ও কুশীনগরে সংঘটিত হয়েছিল।

তীর্থস্থান বলতে আমরা বুঝি কপিলাবস্তু, শ্রাবস্তী, রাজগৃহ, বৈশালী, কৌশাম্বী ইত্যাদি স্থানকে। এসব জায়গায় বুদ্ধের মহাজীবনের অনেক মূল্যবান সময় অতিবাহিত হয়। ধর্ম প্রচার ও শিষ্যদের উপদেশ প্রদান ইত্যাদি অনেক কারণে সেসব জায়গায় তিনি অবস্থান করেন। এসব স্থানে তাঁর ভক্তরা নির্মাণ করেছেন বিহার। রাজা ও মহারাজারা নির্মাণ করেছেন বিহার, সঙ্ঘারাম, চৈত্য, স্তম্ভ ইত্যাদি। এছাড়া বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরে নানা জায়গায় নির্মিত হয়েছে বৌদ্ধ বিহার। সেসব জায়গায় হয়তো বুদ্ধ ভ্রমণ করেননি তবুও ধর্মের প্রচার ও অন্যান্য কারণে সেগুলো পবিত্র তীর্থস্থান হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের মহাস্থান, ভাসু বিহার, ময়নামতি, সীতাকুন্ড ইত্যাদি সেরকম পবিত্র তীর্থস্থান।

প্রতিবছর এসব তীর্থ ও মহাতীর্থস্থানে বৌদ্ধরা পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য যান। এমনকি পৃথিবীর নানা দেশ থেকে নানা ধর্মের মানুষও সেখানে সমবেত হন। তোমরা সুযোগ পেলে দেশ বিদেশের এসব তীর্থস্থানে যাবে। এতে জ্ঞান বাড়ে। পুণ্য সঞ্চয় হয়। মনে প্রশান্তি ভাব জাগে। মন পবিত্র হয়।

এখন আমরা চার মহাতীর্থস্থান সম্পর্কে জানব। নিচে তার বর্ণনা দেওয়া হল :

লুম্বিনী

লুম্বিনী চার মহাতীর্থের মধ্যে অন্যতম। এখানে সিদ্ধার্থের জন্ম হয়। এজন্য লুম্বিনী বৌদ্ধদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র পুণ্যস্থান। রানী মহামায়া কপিলাবস্তু থেকে দেবদহ নগরে পিত্রালায়ে যাওয়ার পথে লুম্বিনী উদ্যানে সিদ্ধার্থের জন্ম হয়। সম্রাট অশোক সিদ্ধার্থের এই পুণ্য জন্মস্থান দর্শন করে স্মৃতি রক্ষার জন্য এখানে একটি স্তম্ভ নির্মাণ করেন। এই স্তম্ভে খোদাই করা আছে অশোকের অনুশাসন লিপি। তা থেকে জানা যায় অশোক তাঁর রাজত্বের বিশ বছরের সময় স্থানটি পরিদর্শন করতে আসেন।

স্তম্ভটি প্রাচীন মন্দিরের পশ্চিম পাশে অবস্থিত। স্তম্ভের চারপাশে লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা আছে। স্তম্ভ একটি অখন্ড পাথরে নির্মিত। শীর্ষদেশে আছে একটি অশ্বমূর্তি। এই অশ্বমূর্তি সিদ্ধার্থের সংসার ত্যাগের প্রতীক। চীনা পরিব্রাজক হিউ-এন সাঙের ভ্রমণ কাহিনীতে এর উল্লেখ আছে। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে ড. ফুলার স্তম্ভটি আবিষ্কার করেন। স্তম্ভে সিদ্ধার্থের জন্মস্থানের কথা লেখা আছে।

অশোক স্তম্ভের পূর্ব পার্শ্বেই লুম্বিনী মন্দির। স্থানীয় লোকেরা এ মন্দিরকে ‘লুম্বিনদেই’ বলে। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলে দেখতে পাওয়া যায় একটি ছোট মন্দির ও বোধিবৃক্ষ। পুরানো মন্দিরের ভিত্তির উপর এই মন্দির নির্মিত। এর উত্তর দিকে নিচে মূল মন্দিরটি অবস্থিত। সিঁড়ি বেয়ে এখানে নামতে হয়। মন্দিরের ভিতর আছে সিদ্ধার্থের জন্মচিত্র আঁকা একটি বড় পাথরের ফলক। সেই জন্মচিত্র আঁকা ফলকটি যুগ যুগ ধরে এখনও টিকে আছে। পাথরের ফলকে মায়াদেবী বাম হাতে শালগাছের একটি ডাল ধরে আছেন। পাশে আর একজন মহিলা। সম্ভবত তিনি মায়াদেবীর বোন মহাপ্রজাপতি গৌতমী। অন্য পাশে দেবতার হাত জোড় করে আছেন। সামনে নিচে একটি পদ্মের উপর নবজাত সিদ্ধার্থ দাঁড়িয়ে আছেন। মন্দিরের প্রাঙ্গণ থেকে অশোকস্তম্ভের দিকে যাওয়ার সিঁড়ি আছে।

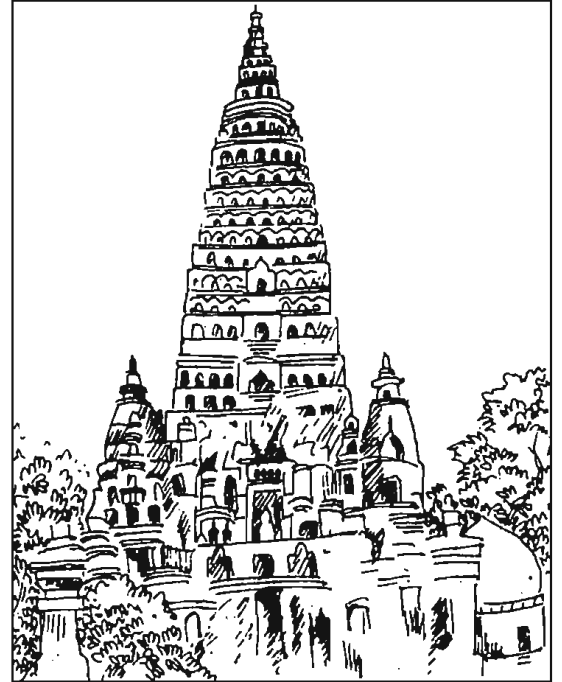
লুম্বিনী নেপালের বুটল জেলার ভগবানপুর তহসিলের ৩ কিলোমিটার উত্তরে পারিয়া গ্রামে ‘লুম্বিনদেই’ নামে প্রসিদ্ধ। ভারতের উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর থেকে ট্রেনে নওগড় হয়ে লুম্বিনী যাওয়ার যায়। নওগড় থেকে লুম্বিনী ৩৫ কিলোমিটার দূরে। লুম্বিনীর সঙ্গে নেপালের রাজধানীর সড়ক যোগাযোগ আছে। কাঠমান্ডু থেকে এরোপ্লেনে সিদ্ধার্থ নগর গিয়ে সড়ক পথেও লুম্বিনী যাওয়া যায়। লুম্বিনীর চারদিকে এখন অরণ্য সৃষ্টি করা হচ্ছে। এজন্য লুম্বিনীর সৌন্দর্য অনেক বেড়ে গেছে।

বুদ্ধগয়া

এটি বৌদ্ধদের চার মহাভীরের অন্যতম। বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষ মূলে গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৮ অব্দে তিনি যে অশ্বথ গাছের নিচে মহাজ্ঞান লাভ করেছিলেন সেই অশ্বথ গাছের নাম হয় মহাবোধি বৃক্ষ। যে আসনে বসে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন সেই আসনের নাম বজ্রাসন বা বোধিপালঙ্ক। এ আসনটি একটি অখণ্ড পাথরে নির্মিত। সম্রাট অশোক তাঁর রাজত্বকালে তীর্থ ভ্রমণে এসে অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে বজ্রাসনটি চিহ্নিত করেন। সেই আসনটি এখনও বুদ্ধগয়ায় আছে।

বোধিবৃক্ষের পাশে ভুবনবিখ্যাত বুদ্ধগয়া মন্দির। মন্দিরটি পূর্বমুখী। এটি একটি দ্বিতল ভবন। উপরের তলা থেকে মন্দিরটি ক্রমশ ছোট হয়ে গেছে। মন্দিরের শীর্ষদেশ গোলাকার। মন্দিরের চার কোণায় চারটি ছোট মন্দির আছে। সামনের দুটিতে ওঠার সিঁড়ি আছে। সিঁড়িতে দুটি পদ্মপাণি বোধিসত্ত্বের মূর্তি অপরূপ শোভা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মূল মন্দিরের গর্ভগৃহে আছে অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের দাঁড়ানো মূর্তি। মন্দিরের গায়ে সারিবদ্ধ কুলজাতে বুদ্ধ এবং বৌদ্ধ দেবদেবীর অনেক মূর্তি আছে। এগুলো পাথরে খোদাই করা। মন্দিরের ভিতরে ও বাইরে সারা গায়ে এভাবে অপরূপ কারুকাজ আছে।

মূল মন্দিরের ভিতরে আছে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় বসা বড় বুদ্ধমূর্তি। মূর্তির গায়ের চীবর সূক্ষ্ম রেখা দ্বারা খোদিত বাইরে পাঁচটি কক্ষে সারিবদ্ধ ৫টি বুদ্ধমূর্তি আছে।



বুদ্ধগয়া মন্দিরের ছবি

মন্দিরের সীমার মধ্যে ও বাইরে আরও কিছু দর্শনীয় স্থান আছে। এগুলো হচ্ছে অনিমেস চৈত্য, চক্রমণ চৈত্য, রত্নখর চৈত্য, অজপাল ন্যাগ্রোথ বৃক্ষ, মুচলিন্দ মূল ও রাজায়তন বৃক্ষ। বোধিপালঙ্কসহ এই সাতটি পুণ্যস্থানের নাম সপ্তমহাস্থান। বুদ্ধত্ব লাভের পর এই সাতটি স্থানে বুদ্ধ এক সপ্তাহ করে সাত সপ্তাহ অবস্থান করেছিলেন। মন্দিরের উত্তর পাশে বুদ্ধের পদচিহ্ন খোদাই করা পাথর আছে। মন্দিরের চারদিকে রয়েছে উঁচু পাথরের প্রাচীর। প্রাচীরের গায়ে বুদ্ধের জীবনের বহু ঘটনা ও জাতকের কাহিনী খোদাই করা আছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতি বছর অগণিত মানুষ বুদ্ধগয়া দেখতে আসেন। বৌদ্ধরা সেখানে মা বাবা ও পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করেন। অনেকে শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষিত হন। এখানে তীর্থযাত্রীদের থাকার জন্য সুব্যবস্থা আছে। মহাবোধি সোসাইটি, বিড়লা মন্দির, সার্কিট হাউজ ইত্যাদি থাকার উত্তম স্থান। এছাড়া রয়েছে চীন, জাপান, বার্মা (বর্তমান মায়ানমার), থাইল্যান্ড, ভুটান, বাংলাদেশ মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধদের নিজস্ব ভবন ও মন্দির।

বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে যে সমস্ত স্মৃতিসৌধ এখনও বর্তমান, বুদ্ধগয়ার এই মন্দির তার মধ্যে সবচেয়ে পুরানো। সম্রাট অশোক সর্বপ্রথম এটি বড় করে নির্মাণ করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়। ইতিহাসে এই মহাবোধি মন্দির এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে।

ভারতের বিহার রাজ্যের রাজধানী গয়া থেকে ১১ কিলোমিটার দূরে বুদ্ধগয়া। বুদ্ধগয়া নৈরঞ্জনা নদীর তীরে অবস্থিত। নৈরঞ্জনার বর্তমান নাম ফল্লু। বুদ্ধগয়া থেকে সড়কপথে রাজগৃহ, নালন্দা প্রভৃতি তীর্থস্থানে যাওয়া যায়।

সারনাথ

সারনাথ একটি প্রাচীন শহর। এর পূর্ব নাম ছিল ইসিপতন বা মৃগদাব। বারাণসী শহরের অনতিদূরে বরুণা নদীর তীরে শহরটি অবস্থিত। সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্ব লাভের সময় তাঁর পাঁচ শিষ্য কৌণ্ডিন্য, বম্প, ভদ্রীয়, মহানাম ও অশ্বজিৎ এখানে অবস্থান করছিলেন। এই পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের কাছে তিনি প্রথম তাঁর নতুন ধর্ম প্রচার করেছিলেন। সেদিন ছিল শুভ আষাঢ়ী পূর্ণিমা। বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের কাছে ‘ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র’ দেশনা করেন। এজন্য সারনাথ চার মহাতীর্থের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

প্রথম ধর্মদেশনা ছাড়াও নানা কারণে সারনাথের গুরুত্ব অপরিমিত। পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের প্রথম ধর্মদেশনা করার পর বারাণসীর শ্রেষ্ঠপুত্র যশ ও তাঁর চুয়ান্ন জন বন্ধুকে বুদ্ধ প্রবজ্ঞা দিয়েছিলেন। এছাড়া ভয়বেরব সূত্র, পঞ্চ সূত্র, পস সূত্র ইত্যাদি বহু সূত্র এখানে দেশনা করেন। এখানে আছে বিখ্যাত মূলগন্ধকুটি বিহার, অশোকস্তম্ভ প্রাচীন মন্দির ও প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ, বুদ্ধের চক্রমণ স্থান ইত্যাদি পবিত্র জায়গা। এখানে একটি বোধিবৃক্ষের নিচে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের উপদেশরত বুদ্ধের মূর্তি আছে। দূর থেকে দেখতে বুদ্ধ ও তাঁর পাঁচ শিষ্যকে জীবন্ত বলে মনে হয়।

মূলগন্ধকুটির বুদ্ধের পবিত্র দেহধাতু আছে। বছরে একবার এই দেহধাতু অনুষ্ঠান করে জনসাধারণকে দেখার সুযোগ দেওয়া হয়। সম্রাট অশোক তাঁর ধর্মযাত্রা করে এখানে এসেছিলেন। তিনি এখানে একটি অশোকস্তম্ভ নির্মাণ করান। স্তম্ভের গায়ে খোদিত আছে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের উদ্দেশ্যে উপদেশবাণী। স্তম্ভের মাথায় আছে চার মুখবিশিষ্ট সিংহমূর্তি। তার ওপরে আছে ধর্মচক্র। সারনাথের বহু বিহার ও মন্দির ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। মৃগদাব রূপে চিহ্নিত স্থান থেকে কিছু দূরে দূরে ধামেক স্তূপ অবস্থিত। এতে বুদ্ধের দেহধাতু ছিল বলে মনে করা হয়। সম্রাট অশোক বুদ্ধের প্রথম ধর্ম প্রচারের স্থান চিহ্নিত করে এখানে একটি সুবৃহৎ স্তম্ভ নির্মাণ করেন।

মৃগদাব সম্পর্কে একটি কাহিনী আছে। বুদ্ধ তাঁর এক পূর্বজন্মে মৃগদলের নেতা হয়ে জনগ্রহণ করেছিলেন। তখন বোধিসত্ত্বের নাম ছিল সুবর্ণ মৃগ। একদিন এক হরিণী ও তার গর্ভস্থ শাবককে নিজের জীবনের বিনিময়ে বোধিসত্ত্ব রক্ষা করতে গিয়েছিলেন। বোধিসত্ত্বের এই অপূর্ব আত্মত্যাগের পরিচয় পেয়ে বারাণসী রাজা বনের সব হরিণকে মুক্তি দেন। রাজা ঘোষণা করেন, সেই বনের সব হরিণ হবে স্বাধীন। তারা হবে অবধ্য অর্থাৎ কেউ তাদের মারতে পারবে না। সেই থেকে স্থানটির নাম হয় মৃগদাব। বারাণসীর রেলস্টেশন থেকে সড়ক পথে সারনাথ যাওয়া যায়। এছাড়া সারনাথের কাছেও একটি রেলস্টেশন আছে। এখানে তীর্থযাত্রীদের জন্য ধর্মশালা ও সরকারি অতিথিশালা আছে।

কুশীনগর

কুশীনগর বৌদ্ধদের অন্যতম পবিত্র তীর্থভূমি। এখানে গৌতম বুদ্ধ শূভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। প্রাচীনকালে কুশীনগর বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। যেমন-কুশীনারা, কুশীগ্রাম, কুশাবতী ইত্যাদি। ভারতের উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার কোশিয়া নামক স্থানে এটি অবস্থিত। এটি বৌদ্ধদের চার মহাতীর্থস্থানের অন্যতম। প্রাচীনকালে কুশীনগর হিরণ্যবতীর পশ্চিম তীরে ছিল। তখন এটি মল্লদের রাজ্যের রাজধানী ছিল।

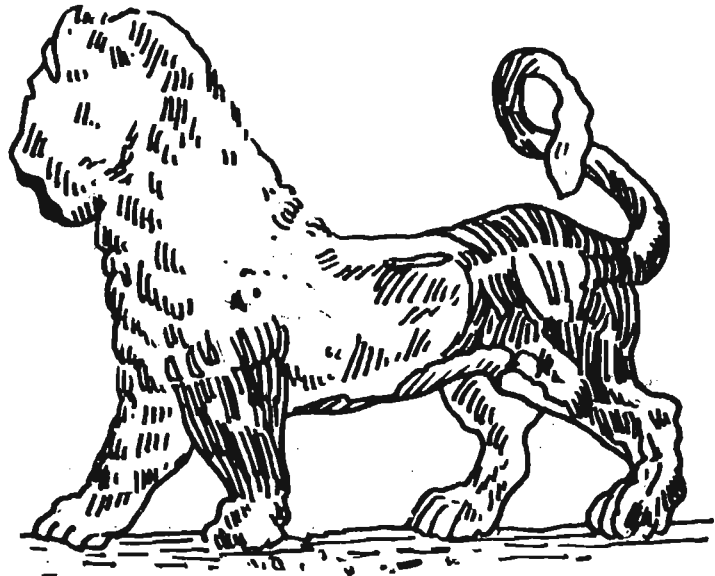
কুশীনগরের অনতিদূরে পাবা। পাবার ধনকুবেরের পুত্র চন্দ্র গৌতম বুদ্ধকে প্রথম দেখেই সোতাপত্তি ফল লাভ করেছিলেন। তিনি তাঁর নিজের আমবাগানে বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধকে দান করেছিলেন। পরিনির্বাণের আগের দিন বুদ্ধ সেখানে পৌঁছেলে চন্দ্র তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সে সময় বুদ্ধ অসুস্থ ছিলেন। অসুস্থ অবস্থায় তিনি চন্দ্রের ঘরে আহার করেছিলেন। এটিই তাঁর শেষ আহার।

সেদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা। অন্তিম শয্যায় বুদ্ধ পরিব্রাজক সুভদ্রকে দীক্ষা দেন। সুভদ্র বুদ্ধের শেষ শিষ্য। তারপর তিনি ভিক্ষুদের উদ্দেশে শেষ উপদেশ দান করেন। মল্লদের জোড়া শালগাছের নিচে অন্তিম শয্যায় শায়িত অবস্থায় পূর্ণিমার শেষ রাতে বুদ্ধ এখানে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন।

গুপ্ত সম্রাট কুমারগুপ্তের সময় হরিবল নামক এক বৌদ্ধ দাতা দীর্ঘ ২২ হাত লম্বা একটি শায়িত বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করেন। এটি এখনও তীর্থযাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর পাশে একটি বড় স্তূপ আছে। এর মধ্যে একটি ‘পরিনির্বাণ তাম্রপট’ নামে তামার পাত পাওয়া যায়। সম্রাট অশোক এই স্থান পরিদর্শন করে বুদ্ধের পরিনির্বাণ স্থান নির্দিষ্ট করেন। চীনা পরিব্রাজক ফাহিয়েন কুশীনগর ভ্রমণ করেন। তিনি এখানে লোকবসতি বেশি দেখেন নি বলে লিখে গেছেন।

উত্তর ভারতের গোরক্ষপুর রেলস্টেশন থেকে সড়ক পথে কুশীনগর যাওয়া যায়। এখানে যাত্রীদের জন্য অতিথিশালা আছে। বুদ্ধগয়া, সারনাথ, কুশীনগর ও লুম্বিনী এই চার মহাতীর্থে সড়ক পথে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যাওয়া যায়। বাংলাদেশ থেকে বহু তীর্থযাত্রী বাসে করে একসঙ্গে চারটি মহাতীর্থস্থান দেখে আসেন।

এই চার মহাতীর্থস্থান দর্শন করা বৌদ্ধদের জন্য অত্যন্ত পুণ্যের কাজ। এরকম ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক তীর্থস্থান পরিদর্শন করলে মন অনাবিল আনন্দে ভরে যায়। মনের উদারতা বাড়ে, ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জাগে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত লোকজনের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ ঘটে। মনের ভাব আদান প্রদান করা যায়, বন্ধুত্ব হয়। এই বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়তা করে।



ধর্মপ্রচার প্রতীক-সিংহমূর্তি

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বুদ্ধ কত বছর ধরে প্রাচীন ভারতে ধর্ম প্রচার করেন?
ক. ২২ বছর
খ. ২৬ বছর
গ. ৪১ বছর
ঘ. ৪৫ বছর
২. বৌদ্ধবিহার নির্মাণের পেছনে উদ্দেশ্য কী?
ক. বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটানো
খ. বৌদ্ধভিক্ষুদের সমাবেশ ঘটানো
গ. বুদ্ধকে স্মরণ করা
ঘ. ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত করা
৩. স্মৃতি বড়ুয়া একজন পুণ্যবান শিক্ষার্থী। একজন শিক্ষার্থী হিসেবে সে কীভাবে পুণ্য সঞ্চয় করবে?
ক. জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে
খ. উপাসনার মাধ্যমে
গ. বৌদ্ধ সংগীতি আয়োজনের মাধ্যমে
ঘ. মহাতীর্থগুলো সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে
৪. একজন ধনুকুণ্ডের পুত্র চন্দ্র বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। উক্ত নিমন্ত্রণ দ্বারা তিনি কী অর্জন করেন?
i. বুদ্ধের সান্নিধ্য লাভ
ii. সোতাপত্তি ফল লাভ
iii. মার্গফল লাভ
iv. মহাপুণ্য অর্জন

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i ও ii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বৌদ্ধধর্মে অনেক পবিত্র তীর্থস্থানের নাম উল্লেখ আছে। পৌত্তম বুদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য অনেক স্থান ভ্রমণ করেছিলেন। বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলো পরিদর্শনের মাধ্যমে মনের কালিমা দূর হয়, আত্মার উন্নতি ঘটে। অতএব, তীর্থস্থান ভ্রমণের মাধ্যমে চারিত্রিক উন্নতি সাধন করা যায়। বিশেষ করে যুব সমাজের বেলায় এটি বেশি প্রযোজ্য।
ক. বুদ্ধগয়া কী?
খ. বুদ্ধগয়া একটি পবিত্র তীর্থস্থান কেন? ব্যাখ্যা কর।
গ. যুব সমাজকে নৈতিকভাবে উন্নত হতে হলে কী করতে হবে?
ঘ. তীর্থস্থান ভ্রমণ মানব জীবনকে উন্নত করে, উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।
২. বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা মহামতি বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলোকে পুণ্যভূমি হিসেবে স্মরণ করে। এ পবিত্র স্থানগুলোকে আবার তীর্থ ও মহাতীর্থ নামে ভাগ করা হয়েছে। অবিনাশ চাকমা এ বিষয়টি অনুধাবন করে পুণ্য সঞ্চয় ও মানসিক প্রশান্তি লাভের জন্য বুদ্ধগয়া ভ্রমণ করেন।
ক. তীর্থস্থান অর্থ কী?
খ. তীর্থস্থান ভ্রমণের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
গ. তীর্থ ও মহাতীর্থের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।
ঘ. একজন শিক্ষার্থী হিসেবে মহাতীর্থ ভ্রমণকে তুমি কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবে বিশ্লেষণ কর।
৩. মানসী বড়ুয়ার মতে বৌদ্ধ তীর্থস্থান দর্শন করা অত্যন্ত পুণ্যের কাজ। এতে মনের উদারতা বাড়ে, ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাও জাগে। তিনি একবার বুদ্ধগয়া গেলেন। বিভিন্ন দর্শনার্থীর সাথে সাক্ষাৎ করে তিনি ধর্ম সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন। মূলত সংস্কৃত মানুষকে ধর্মের পথে ধাবিত করে। অসংস্কৃত মানুষের পথে নিয়ে যায়।
ক. ২টি বৌদ্ধ তীর্থস্থানের নাম লেখ।
খ. পুণ্য অর্জন কী? ব্যাখ্যা কর।
গ. ধর্মজ্ঞান লাভ করতে হলে কী করণীয়?
ঘ. ‘কর্মই ধর্মের পথ দেখায়’-উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

অষ্টম অধ্যায়

চরিতমালা

পৃথিবীতে যুগে যুগে অনেক স্মরণীয় ও বরণীয় মানুষ জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁদের আলোয় জগৎ আলোকিত হয়েছে। এজন্য সকল মানুষ তাঁদের শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে, ভক্তি করে। তাঁদের নির্মল চরিত্র মানুষের হৃদয় সহজেই জয় করে নেয়। তাঁরা নিষ্পাপ, ন্যায়বান ও হৃদয়বান। জ্ঞানে, গুণে তাঁরা মহান। এ সকল মহৎ ব্যক্তির জীবন সকলের অনুকরণীয়। তাঁদের জীবনী আমাদের সবার পাঠ করা উচিত।

সং, চরিত্রবান ও মহৎ লোকের জীবনী পাঠে অনেক বিষয় জানা যায়। এতে মন সুন্দর হয়। তাঁদের মতো চরিত্রবান হওয়ার ইচ্ছা মনে জাগে। মহৎ মানুষের জীবনকথা সং জীবন যাপনে প্রেরণা যোগায়।

ত্রিপিটক সাহিত্যে এমন কিছু মহৎ নারী পুরুষের জীবন সম্পর্কে জানা যায় যাঁরা আজও নানা কারণে স্মরণীয় ও বরণীয়। তাঁরা বুদ্ধের ধর্মপ্রচারে অনুপ্রাণিত হয়ে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন। অনেকে বুদ্ধের আদর্শে সংসার ত্যাগ করে ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন। বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার ও প্রসারে তাঁদের বিশেষ অবদান রয়েছে। এঁদের মধ্যে যাঁরা পুরুষ তাঁরা থের নামে পরিচিত। আর মহিলারা থেরী নামে অভিহিত।

থেরদের মধ্যে মহাক্যাশ্যপ, উপালি, আনন্দ, সারিপুত্র, মৌদগল্লান প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। থেরীদের মধ্যে মহাপ্রজ্ঞাপতি গৌতমী, পূর্ণিকা, অনোপমা, ক্ষেমা প্রমুখ বিখ্যাত। এছাড়া অনেকে গৃহীজীবন যাপন করে বৌদ্ধধর্মের সেবা করেছেন। ধর্ম প্রচার করতে সাহায্য করেছেন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে তাঁরা বিশিষ্ট বৌদ্ধ নামে খ্যাত। এঁদের মধ্যে রাজা বিন্ধিসার, অজাতশত্রু, অনাথপিণ্ডিক, বিশাখা, সুজাতা, মল্লিকা প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

এখন আমরা কয়েকজন থের থেরী ও বিশিষ্ট বৌদ্ধের জীবনী সম্পর্কে জানব। বৌদ্ধধর্মে তাঁদের অবদানের কথা স্মরণ করব। তোমরা এঁদের আদর্শ অনুসরণ করবে। চেষ্টা করলে তোমরাও এঁদের মতো হতে পারবে।

উপালি

উপালির জন্ম কপিলাবস্তুর রাজকুলের নাপিত বংশে। তাঁর গৃহী নাম ছিল পূর্ণ। পূর্ণের মাতার নাম ছিল মন্তাপী। পূর্ণ, অনরুদ্ধ, ভৃগু, কেম্বিল, ভদ্রীয়, আনন্দ, দেবদত্ত প্রমুখ রাজপুত্রের সহচর ছিলেন। বুদ্ধ একসময়ে অনুপ্রিয়ের আশ্রমে অবস্থান করছিলেন।

সে সময়ে কয়েকজন রাজপুত্র ঠিক করলেন তাঁরা একত্রে বুদ্ধের নিকট গিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবেন। এই ভেবে তাঁরা একদিন যাত্রা করলেন। পূর্ণকেও তাঁরা তাঁদের সঙ্গে নিলেন। কপিলাবস্তু থেকে কিছু দূরে এসে তাঁরা থামলেন। তারপর সকলে নিজেদের মূল্যবান পোশাক খুলে পূর্ণের হাতে তুলে দিলেন। তাঁরা বললেন, পূর্ণ, এসব তোমাকে দিলাম। তুমি কপিলাবস্তুতে ফিরে যাও। এই বলে রাজপুত্ররা চলে গেলেন। পূর্ণ তখন ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, আমি একাকী কপিলাবস্তুতে ফিরে গেলে প্রাণে রক্ষা পাব না। তিনি আরও ভাবলেন, নাপিত বংশে আমার জন্ম। এই মূল্যবান পোশাক আমার উপযুক্ত নয়। তাছাড়া ওঁরা রাজপুত্র। বিপুল অর্থ, ধনসম্পদ, প্রভাব ও প্রতিপত্তি ওঁদের আছে। এসব ছেড়ে তাঁরা যদি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে পারেন, আমি কেন পারব না? আমার তো কিছু নেই— এই বলে তিনি মূল্যবান পোশাকগুলো একটি গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে রাজকুমারদের পথে পা বাড়ালেন। অনরুদ্ধ, ভৃগু, আনন্দ প্রমুখ রাজকুমারগণ বুদ্ধের কাছে গিয়ে প্রব্রজ্যাধর্মে দীক্ষিত হবার প্রার্থনা জানালেন। এমন সময় পূর্ণও এসে বুদ্ধকে প্রণাম করে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করলেন। তখন রাজকুমারগণ বললেন, ভগ্নে আগে পূর্ণকে প্রব্রজ্যা দিন। তাহলে তাকে আমরা প্রণাম ও সম্মান করতে বাধ্য হব। এতে আমাদের বংশমর্যাদার অহংকার দূর হবে।



রাজপুত্ররা পূর্ণকে মূল্যবান পোশাক দিচ্ছেন

তাদের এই অনুরোধ শুনে বুদ্ধ খুশি হলেন। বুদ্ধ প্রথমে পূর্ণকে এবং পরে রাজকুমারদের প্রব্রজ্যা দান করলেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করার পর পূর্ণের নাম হয় উপালি।

প্রব্রজ্যা গ্রহণের কয়েকদিন পরেই উপালি বুদ্ধের নিকট অরণ্যে বসবাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু বুদ্ধ তাঁকে নিজের সঙ্গে থাকতে বললেন। উপালি বুদ্ধের উপদেশের মাধ্যমে অতি অল্প সময়ে অর্হন্ত ফল লাভ করেন। বুদ্ধের সঙ্গে থেকে উপালি বিনয়ে পারদর্শিতা অর্জন করেন। বিনয়ে দক্ষতা দেখে বুদ্ধ তাঁকে ‘বিনয়ধর’ (সর্বশ্রেষ্ঠ) বলে ঘোষণা করেন।

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর প্রথম মহাসংগীতিতে উপালি বিনয় আবৃত্তি করেন।

আনন্দ

বুদ্ধের প্রধান শিষ্যদের মধ্যে আনন্দ অন্যতম। তিনি কুমার সিদ্ধার্থের কাকার পুত্র ছিলেন। তাঁর পিতার নাম অমিতোদন। সিদ্ধার্থ ও আনন্দ একই দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অনুরুদ্ধ, ভৃগু, ভদ্রীয় ও অন্যান্য শাক্য রাজকুমারদের সাথে তিনি একই দিনে বুদ্ধের কাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। আনন্দ খুব সুপুরুষ ছিলেন। তিনি বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। আর ছিলেন ভালো বক্তা। তাঁর শারীরিক সৌন্দর্য ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য সকলেই তাঁকে ভালোবাসতেন।

বুদ্ধের বয়স তখন ৫৫ বছর। এ সময় তাঁর একজন স্থায়ী সেবক দরকার হয়। সারিপুত্র, মৌদগল্লান এবং আনন্দসহ অনেকেই বুদ্ধের সেবক হতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। বুদ্ধ জানতেন, আনন্দ কল্পকাল ধরে এই পদের জন্য পুণ্য সঞ্চয় করে আসছেন। আনন্দ তখন মাত্র সোতাপত্তি ফল লাভ করেছিলেন। বুদ্ধ তাই আনন্দকেই স্থায়ী সেবক পদে নিযুক্ত করেন। সেদিন থেকে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভ পর্যন্ত আনন্দ সবসময় তাঁর সাথে সাথে ছিলেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বুদ্ধের সেবা করেছেন। বুদ্ধ যখন উপদেশ দিতেন তিনি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনতেন। সব কথা মনে রাখতেন। প্রয়োজনে তা অবিকল অন্যকে বলতে পারতেন। এজন্য তিনি ‘ধর্মভান্ডারিক’ বা ‘শ্রুতিধর’ ভিক্ষু বলে খ্যাত ছিলেন।

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভের অল্পকাল পরেই রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম মহাসংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। মহাসংগীতিতে একমাত্র অর্হৎ ভিক্ষুদেরই প্রবেশাধিকার ছিল। তবে বুদ্ধের ঘনিষ্ঠ সহচর ও শ্রুতিধর হিসেবে আনন্দের জন্য একটি আসন সংরক্ষিত ছিল। এ খবর পেয়ে আনন্দ মহাসংগীতির পূর্বরাতে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হন।

এদিকে মহাসংগীতি উপলক্ষে একে একে সকল অর্হৎ ভিক্ষু সমবেত হলেন। শুধু আনন্দ অনুপস্থিত। মহাসংগীতি শুরু হল। হঠাৎ সকলেই দেখলেন আনন্দ তাঁর আসনে বসে আছেন। সকলের মুখ খুশিতে ভরে উঠল। প্রথম মহাসংগীতিতে আনন্দ ধর্ম [সূত্র অভিধর্ম] আবৃত্তি করেছিলেন।

ভিক্ষুণী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠায়ও তাঁর ভূমিকা ছিল প্রধান। মহারাজ শুম্ভোদনের মৃত্যুর পর মহাপ্রজাপতি গৌতমী বুদ্ধের কাছে গিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু বুদ্ধ প্রথমে এতে সম্মত হননি। পরে আনন্দের প্রবল অনুরোধে নারীদেরও সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার অনুমোদন করেন।

অনোপমা থেরী

অনোপমা সাকেত নগরে বিত্তশালী শ্রেষ্ঠী মজ্জবের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মজন্মান্তরের পুণ্যফলেই তিনি বুদ্ধের সময়ে জন্ম নিয়েছিলেন। তিনি অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন। তাই তাঁর নাম অনোপমা রাখা হয়। অনোপমা বিবাহের উপযুক্ত হলে তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে বহু রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, শ্রেষ্ঠীপুত্র ও ধনবান যুবক তাঁকে বিবাহ করতে আগ্রহী হন। অনোপমাকে পাওয়ার জন্য তাঁরা অনোপমার ওজনের আটগুণ হীরা ও রত্ন দেওয়ার প্রস্তাব দেন। কিন্তু অনোপমা সংসার ধর্ম পালনে উদাসীন ছিলেন।

এসময় এক শুভদিনে তিনি বুদ্ধকে বন্দনা করতে যান। পুণ্যবতী অনোপমাকে দেখেই বুদ্ধ তাঁর মনের ইচ্ছা বুঝতে পারলেন। অনোপমা বুদ্ধকে বন্দনা করে এক পাশে বসলেন। বুদ্ধ তাঁকে ধর্মদেশনা করেন। বুদ্ধের মুখে ধর্মকথা শুনতে শুনতে অনোপমা অনাগামী ফল লাভ করেন। বৌদ্ধধর্মে এই অনাগামী ফল হল নির্বাণ লাভের তৃতীয় ধাপ।

অনোপমা আর ঘরে ফিরলেন না। সংসারের সবকিছু ত্যাগ করে তিনি ভিক্ষুণী হয়ে গেলেন। সেদিনই তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। পরম আশ্চর্যের বিষয় সপ্তম রাত্রেই তিনি সকল তৃষ্ণা থেকে মুক্ত হলেন। অর্হত্ত্ব ফল লাভ করলেন।

থেরী গাথাতে অনোপমা তাঁর নিজের কথা গাথার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। সেই গাথা থেকে আমরা তাঁর জীবন সম্পর্কে এসব জানতে পারি। গাথায় তিনি লিখেছেন—

‘আমি উঁচু কূলে মহাবিশ্বশালী মজ্ঝা শ্রেণীর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। আমি খুব সুন্দরী ছিলাম।

অনেক রাজপুত্র ও শ্রেষ্ঠপুত্র আমাকে পাওয়ার জন্য খুব ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁরা আমার মাতাপিতার নিকট দূত পাঠিয়ে একে একে সবাই বলেছিলেন, অনোপমাকে আমায় দান করুন। আপনার কন্যা অনোপমার ওজন যত হয়, তার আটগুণ হীরা জহরত প্রদান করব।

আমি ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ, অনুত্তর সম্যকসম্বুদ্ধের দর্শন লাভ করি। বুদ্ধ করুণা করে আমাকে ধর্মদেশনা করেন। আমি সেই আসনে বসেই অনাগামী ফল লাভ করি। তারপর কেশরাশি ছেদন করে প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষিত হই। সকল তৃষ্ণা ক্ষয় করে অর্হন্ত ফল লাভ করি।’

অনোপমার সব ছিল। ধন-সম্পদ, দেহের সৌন্দর্য—কিছুরই অভাব ছিল না তাঁর। কিন্তু সংসারের সকল সুখ ও বিলাস ত্যাগ করে তিনি বুদ্ধের ধর্মে দীক্ষা নেন।

তিনি বুঝেছিলেন ভোগে সুখ নেই, ত্যাগেই সুখ। অনোপমা থেরী আমাদের কাছে এজন্য আদর্শ নারী। তিনি আমাদের পরম শ্রম্ভার পাত্রী।

পূর্ণিকা থেরী

পূর্ণিকা রাজগৃহের এক ধনী শ্রেষ্ঠীর পরিচারিকা ছিলেন। একদিন শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে এক ভোজের আয়োজন হয়। ঘরে বিশেষ কোনো আয়োজন হলেই দাসদাসীদের কাজ বেড়ে যায়। পূর্ণিকার ওপর পড়ল ধান ভানার কাজ। কিন্তু দিনের মধ্যে কাজ শেষ হল না। তাই তিনি রাতেও কাজ করতে লাগলেন। একটানা পরিশ্রমের পর তিনি বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

শ্রেষ্ঠীর বাড়ির সামনেই ছিল একটি বৌদ্ধ বিহার। সেখানে তখন বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের নিয়ে বাস করছিলেন। বিহারের কামরাগুলোয় তখন আলো জ্বলছে। পূর্ণিকা ভাবলেন, এত রাত পর্যন্ত বিহারে আলো জ্বলছে কেন? ভিক্ষুরা তো গৃহত্যাগী। তাঁদের এত কাজ কিসের? এসব কথা ভাবতে ভাবতে রাত ভোর হয়ে গেল।

পূর্ণিকা প্রতিদিন ভোরে স্নান করেন, তাই তিনি স্নান করতে যাবেন। বাকি কাজটুকু স্নান করে এসে করবেন। রান্নাঘরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন একটা পাত্রে কিছু লাল আটা পড়ে আছে। পূর্ণিকা সেই আটা দিয়ে কয়েকটা রুটি তৈরি করলেন। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে রুটিগুলো পোড়া পোড়া হয়ে গেল। ভাবলেন, স্নান করে সেগুলো ঘাটে বসে খাবেন।

তখন প্রায় ভোর হয়ে গেছে। নদীর ঘাটে পূর্ণিকা একা। স্নানও শেষ। এমন সময় দেখলেন ঝয়ং বুদ্ধ এগিয়ে আসছেন। হাতে ভিক্ষাপাত্র। পিছনে সেবক আনন্দ ও অন্যান্য ভিক্ষু। বুদ্ধকে দেখে পূর্ণিকার মন আনন্দে ভরে উঠল। একবার প্রাণভরে বন্দনা করার খুব ইচ্ছা জাগল।

ততক্ষণে বুদ্ধ ভিক্ষাপাত্র হাতে সামনে এসে গেছেন। পূর্ণিকা মুখ তুলে তাকালেন। বুদ্ধের সৌম্য চেহারা দেখে অভিভূত হয়ে গেলেন। তারপর মনের সমস্ত সাহস এক করে বুদ্ধের পাত্রে পোড়া রুটিগুলো দান করলেন। ভক্তির ভরে প্রণাম জানিয়ে বললেন, প্রভু আমি ক্রীতদাসী। এই সামান্য দান গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ করুন।

বুদ্ধ সবকিছু জানেন। তিনি পূর্ণিকার মনের ভাব বুঝতে পেরে বললেন মা, তোমার দান গ্রহণ করলাম। ভক্তির দান সামান্য হলেও মহামূল্যবান। তুমি মনে কষ্ট নিও না। বুদ্ধ নদীর ধারে এক গাছের নিচে বসলেন। শিষ্যদের নিয়ে

সেই পোড়া রুটি তৃপ্তি ভরে খেলেন। এ দৃশ্য দেখে পূর্ণিকার চোখ জলে ভরে গেল। তখন বুদ্ধের কাছে গিয়ে পূর্ণিকা ভয়ে ভয়ে জানতে চাইলেন, প্রভু, গভীর রাতে দেখলাম বিহারে আলো জ্বলছে। আপনারা সংসারত্যাগী, আপনাদের কোনো ঝামেলা নেই। তবুও আপনাদের চোখে ঘুম আসে না কেন? বুদ্ধ হেসে বললেন, রাত জেগে আমরা ধ্যান করি।



পূর্ণিকা বুদ্ধকে রুটি দান করছেন

প্রকৃত ভিক্ষুরা রাতে ধ্যান করে। ধ্যানে তৃষ্ণা ক্ষয় হয়। বুদ্ধের এই অমৃতবাণী শুনে পূর্ণিকার মন থেকে সংশয় দূর হয়ে গেল। তিনি তখন তাঁকে ভিক্ষুণী ধর্মে দীক্ষা দিলেন। তারপর তিনি বিদর্শন ভাবনা অভ্যাস করে অর্হন্ত ফল লাভ করলেন।

একজন সামান্য ক্লীতদাসীও যে সাধনার বলে অর্হৎ হতে পারেন তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ পূর্ণিকা থেরী। থেরী গাথায় পূর্ণিকার গাথা সংকলিত আছে।

অনাথপিণ্ডিক

বুদ্ধের জীবিতকালে ভিক্ষু ছাড়াও অনেক গৃহীও বুদ্ধের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনাথপিণ্ডিকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সে সময়ে শ্রাবস্তীতে সুমন নামে এক মহাধনবান শ্রেষ্ঠী বাস করতেন। সুদত্ত নামে তাঁর এক পুত্র ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি পিতার বিশাল ধনসম্পদের অধিকারী হন। এরকম ধনবানদের শ্রেষ্ঠী বলা হয়। সুদত্ত শ্রেষ্ঠী অত্যন্ত দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। গরিব ও দুঃখীদের তিনি মুক্ত হস্তে দান করতেন। কোনো অসহায় মানুষ তাঁর বাড়ি থেকে শূন্য হাতে ফিরে যেত না। বিশেষত অনাথদের পিণ্ডদান করতেন বলেই সকলের কাছে তিনি ‘অনাথপিণ্ডিক’ নামে পরিচিত হন।

এক সময় বুদ্ধ রাজগৃহের শীতবনে অবস্থান করছিলেন। সেসময়ে অনাথপিণ্ডিক ব্যবসার কাজে একবার রাজগৃহে আসেন। সেখানে তাঁর এক শ্রেষ্ঠী বন্ধুর বাড়িতে তিনি অতিথি হন। আগেও অনাথপিণ্ডিক কয়েকবার তাঁর বন্ধুর বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন। তখন তিনি খুবই আদর যত্ন পেয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন তাঁকে আগের মতো সমাদর করতে কেউ এগিয়ে এল না। তাঁর বন্ধুও ছিলেন খুব ব্যস্ত। অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী বন্ধুর কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন যে বুদ্ধ তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসবেন। এজন্য তিনি খুব ব্যস্ত।

বুদ্ধের কথা শুনেই অনাথপিণ্ডিকের মন অজানা আনন্দে ভরে উঠল। তিনি আর কিছুই বললেন না। সে রাতে ভালো করে ঘুমাতেও পারলেন না। খুব ভোরে উঠে তিনি বুদ্ধের কাছে গেলেন। বুদ্ধ তখন চত্ক্রমণ করছিলেন। শ্রেষ্ঠী বুদ্ধকে বন্দনা করে এক পাশে বসলেন। বুদ্ধও তাঁকে ধর্মদেশনা করলেন। বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনে অনাথপিণ্ডিক সেখানেই সোতাপত্তি ফল লাভ করলেন। সোতাপত্তি ফলের অর্থ হল নির্বাণ লাভের প্রথম ধাপ। ফেরার সময় অনাথপিণ্ডিক বুদ্ধকে শ্রাবস্তীতে বর্ষাবাস যাপনের জন্য অনুরোধ জানান। বুদ্ধ তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

অনাথপিণ্ডিক শ্রাবস্তীতে ফিরে গিয়ে ‘কী করলে বুদ্ধ খুশি হবেন’ এ বিষয়ে ভাবতে লাগলেন। শ্রাবস্তীতে রাজকুমার জেত-এর মনোরম একটি উদ্যান ছিল। তাঁকে অনেক অনুরোধ করে আঠার কোটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে সেই উদ্যান ক্রয় করলেন। সেখানে নির্মাণ করলেন মনোরম মহাবিহার। এই বিহারের মাঝখানে বুদ্ধের জন্য নির্মিত হয় মূল গন্ধকুটি বিহার। এর চারদিকে নির্মিত হল আশি জন স্তবিরের জন্য বাসভবন। এ ছাড়া সেখানে নির্মিত হল চত্ক্রমণশালা, ভিক্ষুদের জন্য আশ্রম, দিঘি প্রভৃতি। রাজগৃহ থেকে শ্রাবস্তীর দূরত্ব প্রায় নব্বই মাইল। বুদ্ধের যাতায়াতের সুবিধার জন্য প্রতি দুই মাইল অন্তর মোট পঁয়তাল্লিশটি বিশ্রামাগার তিনি নির্মাণ করলেন। বিহারসহ এতে ব্যয় হয় আঠার কোটি স্বর্ণমুদ্রা।

তিন মাস ধরে চলে বিহারে দান অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে খরচ হয় আঠার কোটি স্বর্ণমুদ্রা। রাজকুমার জেত-এর নাম অনুসারে এই জায়গার নাম রাখা হয় জেতবন। বিহারের নাম রাখা হয় অনাথপিণ্ডিকের আরাম। অনাথপিণ্ডিক অত্যন্ত বুদ্ধভক্ত ছিলেন। প্রতিদিন তিন বেলা তিনি সেই বিহারে যেতেন। বুদ্ধকে প্রণাম করতেন। ধর্মকথা শুনতেন। অনাথপিণ্ডিকের বাড়িতে প্রতিদিন পাঁচশত ভিক্ষুর জন্য খাদ্য প্রস্তুত থাকত। বুদ্ধ উনিশবার এই মহাবিহারে বর্ষাবাস যাপন করেছিলেন। বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারে অনাথপিণ্ডিকের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অতীশ দীপংকর

যুগে যুগে বাংলাদেশে বহু জ্ঞানী পণ্ডিত ও মনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁরা নিজ গুণে বিশ্বের ইতিহাসে শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছেন। অমর হয়ে আছেন মানুষের মনের মন্দিরে। সেই রকম এক মনীষী অতীশ দীপংকর।

অতীশ দীপংকর বাংলাদেশেরই লোক ছিলেন। ৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে প্রাচীন ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগনার বজ্রযোগিনী গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতার নাম কল্যাণশ্রী। মাতার নাম প্রভাবতী। জন্মের পর মা বাবা আদর করে তাঁর নাম রাখেন চন্দ্রগর্ত। বজ্রযোগিনী গ্রামে এখনও তাঁর বসতিভিটার চিহ্ন রয়েছে। সেখানকার লোকেরা সেই স্থানটিকে বলেন নাস্তিক পন্ডিতের ভিটা। চন্দ্রগর্ত শৈশবকাল থেকেই খুব মেধাবী ছিলেন। জ্ঞানসাধনার প্রতি তাঁর প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। খুব অল্প সময়েই তিনি সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাছাড়া চিকিৎসাশাস্ত্র ও কারিগরি বিদ্যায়ও তিনি গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তারপর আরও জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি চলে গেলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঘুরে ঘুরে দেখলেন বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র।

চন্দ্রগর্ত ঊনত্রিশ বছর বয়সে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তখন তাঁর নতুন নাম হয় দীপংকর শ্রীজ্ঞান। একত্রিশ বছর বয়সে দীপংকর শ্রীজ্ঞান সুবর্ণ দ্বীপে যান। তাঁর সঙ্গে ছিল শতাধিক শিষ্য। সেখানে তিনি দীর্ঘ বার বছর বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন।

তারপর দীপংকর শ্রীজ্ঞান দেশে ফিরে আসেন। তখন বাংলাদেশের রাজা ছিলেন নয়পাল। রাজার অনুরোধে তিনি বিক্রমশীলা মহাবিহারের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। এছাড়া একসময়ে তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাচার্যও ছিলেন।

তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময়ে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মে নানারকম অনাচার প্রবেশ করে। তিব্বতের রাজা দীপংকর শ্রীজ্ঞানের অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা শুনে তাঁকে তিব্বতে আমন্ত্রণ জানান। রাজার ধারণা ছিল দীপংকর শ্রীজ্ঞানকে নিয়ে যেতে পারলে সে দেশের মানুষের প্রকৃত ধর্মীয় চেতনার বিকাশ ঘটবে।

দীপংকর শ্রীজ্ঞান রাজার আমন্ত্রণে প্রথম সাড়া দেননি। কিন্তু পরে তিনি রাজি হন। আনুমানিক ১০৪১ সালে দীপংকর শ্রীজ্ঞান তিব্বতের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

সে সময় তিব্বতে যাওয়ার পথ সুগম ছিল না। অনেক কষ্টে হিমালয়ের দুর্গম পথ অতিক্রম করে তিনি তিব্বতে প্রবেশ করেন। তিব্বত সীমান্তে অপেক্ষারত রাজপ্রতিনিধিরা দীপংকর শ্রীজ্ঞানকে বিপুল সৎসর্ঘনা জানান। তিনি তিব্বতের প্রধান প্রধান শহর, নানা গ্রাম ঘুরে সন্ধ্যা প্রচার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও ব্যবহারে লোকে মুগ্ধ হয়। তিব্বতের লোক আস্তে আস্তে ফিরে পেল প্রকৃত ধর্মীয় চেতনা। ধর্মে যেসব অনাচার প্রবেশ করেছিল সেগুলো তারা পরিত্যাগ করল।

বিক্রমশীলা ত্যাগ করার সময় দীপংকর শ্রীজ্ঞান বলে গিয়েছিলেন তিব্বতে তিনি মাত্র তিন বছর থাকবেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে দেশে আর ফিরে আসা সম্ভব হয়নি। তিনি আমৃত্যু তিব্বতেই থেকে গেলেন। তিব্বতের মানুষকে তিনি খুব ভালোবেসে ফেলেছিলেন। তিব্বতিরাও তাঁকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করতেন।

দীপংকর শ্রীজ্ঞান তিব্বতি ভাষায় বহু ধর্মীয় গ্রন্থ রচনা করেন। তাছাড়া অনেক বই সংস্কৃত থেকে তিব্বতি ভাষায় অনুবাদ করেন। চিকিৎসা ও কারিগরি বিদ্যা সম্পর্কেও নানা গ্রন্থ তিনি রচনা করে যান।

তিব্বতের ঐগথাং বিহারে তাঁকে ‘অতীশ’ উপাধি প্রদান করা হয়। ‘অতীশ’ খুব সম্মানজনক উপাধি। ১০৫৪ সালে তিব্বতের সেই ঐগথাং বিহারে ৭৩ বছর বয়সে এই মনীষী দেহত্যাগ করেন। অতীশের দেহভস্ম ঢাকা ধর্মরাজিক বিহারে সংরক্ষিত আছে। চীন থেকে এই দেহভস্ম বাংলাদেশে আনা হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. উপালির মায়ের নাম ছিল-
 ক. ক্ষেমা
 গ. বিশাখা
 খ. পূর্ণা
 ঘ. মন্ডাপী
২. বুদ্ধের স্থায়ী সেবক কে ছিলেন?
 ক. সারিপুত্র
 গ. আনন্দ
 খ. উপালি
 ঘ. পূর্ণিকা
৩. পূর্ণিকা ছিলেন একজন ধনী শ্রেষ্ঠীর-
 ক. কন্যা
 গ. ভগ্নি
 খ. স্ত্রী
 ঘ. পরিচারিকা

নিচের অনুচ্ছেদের আলোকে ৪-৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

ত্রিপিটক সাহিত্যে কিছু মহৎ নারী ও পুরুষের জীবন আলোচিত হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকে বুদ্ধের আদর্শে সংসার ত্যাগ করেন। ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন। এরূপ দীক্ষাগ্রহণকারীদের একজন প্রব্রজ্যা গ্রহণের কয়েকদিন পর বুদ্ধের নিকট অরণ্যে বসবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু বুদ্ধ তাকে নিজের সঙ্গে থাকতে বলেন।

৪. যে বুদ্ধের নিকট অরণ্যে বসবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করেন তার গৃহী নাম কী ছিল ?
 ক. ভৃগু
 গ. আনন্দ
 খ. পূর্ণ
 ঘ. দেবদত্ত
৫. প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর তার নাম হয়-
 ক. পূর্ণিমা
 গ. উপালি
 খ. ক্ষেমা
 ঘ. মল্লিকা
৬. অরণ্যে বসবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করলেও বুদ্ধ তাকে নিজের সঙ্গে থাকতে বলেন, কারণ তিনি-
 i. বয়সে ছোট ছিলেন
 ii. ভালো বক্তা ছিলেন
 iii. বিনয়ে পারদর্শী ছিলেন

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i
 গ. iii
 খ. ii
 ঘ. i, ii এবং iii
৭. বুদ্ধের আদর্শে সংসার ত্যাগী এ মহৎ মানুষটির পরিচিতি হচ্ছে-
 ক. থের
 গ. ভিক্ষু
 খ. মহাথের
 ঘ. শ্রামণ
৮. বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারের কাজে আত্মত্যাগী মহৎ ব্যক্তিদের জীবন-
 ক. সকলের অনুকরণীয়
 গ. থেরীদের অনুকরণীয়
 খ. থেরদের অনুকরণীয়
 ঘ. শ্রামণদের অনুকরণীয়

সৃজনশীল প্রশ্ন ৪

১. অনোপমা উঁচু কূলে এক মহাবিশ্বশালীর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খুব সুন্দরী ছিলেন। তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে বহু রাজপুত্র, ধনবান যুবক অনেক হীরা ও রত্নের বিনিময়ে তাঁকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু অনোপমা সংসার ধর্ম পালনের পরিবর্তে এক শুভ দিনে বুদ্ধকে বন্দনা করতে যান। বুদ্ধের মুখে ধর্ম কথা শুনতে শুনতে অনাগামী ফললাভ করেন। তারপর তিনি কেশরাশি ছেদন করে প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষিত হন।
 - ক. অনোপমার এ অনাগামী ফললাভকে বৌদ্ধধর্মে কী বলা হয়?
 - খ. অনোপমা কেন নিজের কেশরাশি ছেদন করেছেন?
 - গ. উপরে বর্ণিত অনোপমার জীবনী থেকে তোমরা কী শিক্ষা লাভ করেছ তা ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. অনোপমার কেশরাশি ছেদন করে প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষিত হবার বিষয়ে তোমার মতামত দাও।
২. শূভ্রা তার সহপাঠী বিধানকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণকারী বাংলাদেশের মনীষীর নাম জিজ্ঞেস করে। উত্তরে বিধান অতীশ দীপংকরের নাম বলে। উত্তর শুনে শূভ্রা বলে তিনি বাংলাদেশের লোক হয়েও আমৃত্যু তিব্বতেই থেকে গেলেন এবং সেখানে দেহত্যাগ করেন।
 - ক. অতীশ দীপংকর বাংলাদেশের কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
 - খ. তিনি কেন আমৃত্যু তিব্বতেই থেকে গেলেন?
 - গ. অতীশ দীপংকর বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে কীভাবে ইতিহাসে একজন মনীষীর মর্যাদা পেলেন?
 - ঘ. বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রসারে অতীশ দীপংকরের অবদান মূল্যায়ন কর।
৩. একদা ভোর বেলায় বুদ্ধ তার সেবক আনন্দ ও অন্যান্য ভিক্ষুদের নিয়ে কোনো এক নদীর ঘাটের দিকে যাচ্ছেন। এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন নদীর ঘাটে একা একটি মেয়ে। মেয়েটির হাতে ছিল কিছু পোড়া রুটি। বুদ্ধ ভিক্ষাপাত্র হাতে তার সামনে এসে পড়েন। মেয়েটি বুদ্ধের সৌম্য চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তারপর বুদ্ধের পাশে পোড়ারুটিগুলো দান করে বললেন প্রভু আমি ক্রীতদাসী, এই সামান্য দান গ্রহণ করুন। বুদ্ধ মেয়েটির দান গ্রহণ করলেন। পরে সাধনার বলে ক্রীতদাসী, পূর্ণিকা অর্হত্ত্ব লাভ করেন।
 - ক. নদীর ঘাটের এ ক্রীতদাসী মেয়েটি কে ছিলেন?
 - খ. বুদ্ধের পাত্রে সামান্য দান করে ক্রীতদাসী মেয়েটির অর্হত্ত্ব লাভ করার ঘটনা ব্যাখ্যা কর।
 - গ. মেয়েটির বদলে তুমি হলে বুদ্ধের প্রতি তোমার আচরণ কেমন হত?
 - ঘ. পূর্ণিমার অর্হত্ত্ব লাভের ঘটনাটি বিশ্লেষণ কর।

নবম অধ্যায়

জাতক

গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মবৃত্তান্ত

এক জন্মের কর্মফলে কেউ বুদ্ধ হতে পারেন না। যিনি বুদ্ধ হবেন তাঁকে বোধিসত্ত্ব হিসেবে অনেক বার নানা কুলে জন্মগ্রহণ করতে হয়। এভাবে জন্মজন্মান্তরের সাধনা, দান, শীল ইত্যাদি দ্বারা পারমী পূর্ণ করতে হয়। চরিত্রকে শুদ্ধ করার জন্যই এই সাধনা। এক জন্মে এই সাধনায় সিদ্ধি হয় না। এক জীবনে সব রকম দানের পারমী পূর্ণ করা সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয় তা জাতকগুলো পড়লে জানা যায়। যেমন :

বোধিসত্ত্বকে নিজের জীবনও উৎসর্গ করতে হয়। আবার স্ত্রীপুত্রকে ত্যাগ করতে হয়। এসব বড় বড় দান করতে হলে মনের উদারতা চাই। তৃষ্ণাকে ক্ষয় করা চাই। এক জীবনে এত বড় বড় কাজ করা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। বোধিসত্ত্ব এভাবে ৫৪৯ বার জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ৫৫০ জন্মে তিনি রাজা শুম্ভাদানের পুত্র সিদ্ধার্থ গৌতমরূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্মে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন।

জাতকের সমস্ত কথাই উপদেশ। এজন্য জাতকের শ্রোতারা জাতক শুনে আনন্দের সঙ্গে উপদেশ লাভ করে। এ ছাড়া জাতকে সকল জীবের প্রতি মমতা লক্ষ করা যায়। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা প্রত্যেক জীবকে নিজের মতো বিবেচনা করে। যিনি এক সময় বুদ্ধ হয়েছেন, অতীত যুগে তিনি হরিণ, মাছ, বানর ইত্যাদি রূপে জন্মেছিলেন। জাতক পাঠ করলে জন্মান্তর সম্পর্কে ধারণা জন্মে এবং কুসংস্কার দূর হয়। শাস্ত্র অপেক্ষা যুক্তি বড় তা শেখা যায়। এসব কারণে জাতক সাধারণ গল্প থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

প্রত্যেক জাতকে তিনটি অংশ আছে। প্রথম অংশের নাম প্রত্যুৎপন্ন বস্তু বা বর্তমান কাল। বুদ্ধ কী উপলক্ষে বা কোন প্রসঙ্গে জাতকটি বলেছিলেন তা বুঝিয়ে দেওয়া এই অংশের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় অংশ প্রকৃত জাতক, অর্থাৎ মূল আখ্যায়িকা। এর নাম অতীতবস্তু। কারণ এটি গৌতম বুদ্ধের অতীতের জীবন বৃত্তান্ত। পরিশেষে আছে সমবধান। জাতকে বর্ণিত পাত্রের সঙ্গে উপস্থিত ব্যক্তির সম্পর্ক নির্দেশকে সমবধান বলা হয়। অর্থাৎ জাতকে বর্ণিত পাত্রদের সঙ্গে বর্তমান কথায় বলা ব্যক্তির এক, তা প্রকাশ করা এর উদ্দেশ্য।

অতএব আমরা বুঝতে পারি বর্তমান কথা মূল জাতকের অংশ নয়। এটি জাতক বলার আগের পটভূমি বা তার ব্যাখ্যা। আর সমবধান হল জন্মান্তরবাদের কথা। এখানে পাঁচটি জাতক বর্ণনা করা হল। এই জাতকগুলোর মধ্যে এখানে শুধু অতীতবস্তু বর্ণনা করা হয়েছে।

সুখ জাতক

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যে এক ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বড় হয়ে বোধিসত্ত্ব সংসার জীবন শুরু করলেন। সে সময় বারাণসীর এক লোকের একটি কুকুর ছিল। কুকুরটি ভালো খাবারদাবার পেয়ে বেশ মোটাসোটা হয়ে উঠেছিল। দেখতেও খুব সুন্দর হল।

একদিন গ্রামের এক লোক বারাণসী নগরে উপস্থিত হল। ঘুরতে ঘুরতে কুকুরটিকে দেখতে পেল। কুকুরটিকে দেখে তার পেতে ইচ্ছা হল। তখন সে কুকুরের মালিককে বলল, ভাই, কুকুরটি খুব সুন্দর, ওটা আমাকে দিন।

কুকুরের মালিক তখন বলল, কুকুরটা আমার বড় আদরের। আপনি নিয়ে গেলেও রাখতে পারবেন না। লোকটি বলল, পারব, আমিও সেরকম আদর-যত্ন করব।

যদি পারবেন মনে করেন তাহলে নিন। কিন্তু তার ওপর অত্যাচার করতে পারবেন না। মারধরও করবেন না। জোরও খাটাতে পারবেন না।

লোকটি বলল, তাই হবে।

তাহলে কত দাম দেবেন?

নগদ এক কাহন ও আমার গায়ের চাদরটি দেব।

তাই হোক। কুকুরটি নিন।

তারপর লোকটি চামড়ার দড়িতে বেঁধে কুকুরটিকে নিয়ে চলল। কুকুরও লোকটি সঙ্গে বাধ্যের মতো চলল। কোনো রকম বিরক্তি প্রকাশ করল না।

অবশেষে কুকুরসহ লোকটি এক বনের কাছে উপস্থিত হল। রাতও হল, রাত কাটাবার জন্য লোকটি একটি ঘরে ঢুকল। কুকুরটিকে সে ঘরের বাইরে বেঁধে রাখল। লোকটি ভাবল, কুকুরটা তো বেশ ভালো। পোষও মেনে গেছে। কাজেই বাইরে বেঁধে রাখা যায়। এই ভেবে সে ঘরের ভিতর ঢুকে কাঠের তক্তার ওপর শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর তার চোখে ঘুম নেমে এল।

এসময় বোধিসত্ত্ব সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি কুকুরটিকে চামড়ার দড়িতে বাঁধা দেখে একটি গাথা বললেন।

কুকুর তুমি বড্ড বোকা নইলে এতক্ষণ,

চর্ম রজ্জু খেয়ে ফেলে করতে পলায়ন।

গাথা শুনে কুকুরটি বলল, আমিও সে কথা ভাবছি। রাত গভীর হোক, সবাই ঘুমিয়ে পড়ুক, তখন সুযোগ পাব।

রাত গভীর হল। লোকটি এবং আশেপাশের লোকজন গাঢ় ঘুমে তলিয়ে গেল। তখন কুকুরটি আস্তে আস্তে চামড়ার দড়ি কেটে আগের প্রভুর কাছে ফিরে গেল।

উপদেশ : সময় ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করা উচিত।

কপোত জাতক

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব পায়রা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন বারাণসীর লোকেরা পুণ্য কামনায় পাখিদের সেবা করত। পাখিদের জন্য ঘরের বাইরে ও ভিতরে নানা জায়গায় ঝুড়ি ঝুলিয়ে রাখত। বোধিসত্ত্ব সেরকম ঝুড়িতে রাতে থাকতেন। সেখান থেকে প্রতিদিন সকালে খাবার খুঁজতে বেরিয়ে পড়তেন। খাবার খেয়ে সন্ধ্যার সময় সেই ঝুড়িতে এসে শুয়ে পড়তেন।

একদিন এক কাক ওই রান্নাঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রান্নার চমৎকার গন্ধ পেল। সে উঁকি মেরে দেখল ভিতরে মাছ, মাংস রান্না হচ্ছে। লোভী কাক বাইরে বসে ভাবতে লাগল, কেমন করে ওই মাছ, মাংস খাওয়া যায়। সন্ধ্যার সময় বোধিসত্ত্বকে রান্নাঘরে ঢুকতে দেখে ভাবল, পায়রাটার সঙ্গে ভাব করেই উদ্দেশ্য সফল করতে হবে।

পরদিন ভোরে বোধিসত্ত্ব ঘুম থেকে উঠে খাবার খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন। কাকও তাঁর পিছন পিছন ছুটল। বোধিসত্ত্ব

বললেন, তুমি আমার সঙ্গে চললে কেন? কাক বলল, আপনার চালচলন আমার খুব ভালো লাগছে। আমি এখন থেকে আপনার অনুচর হয়ে থাকব।



পাচক রান্না ঘরে ছুটে এলো

এভাবে কাকটি বোধিসত্ত্বের সঙ্গে থাকতে লাগল। পাচক দেখল পায়রার সঙ্গে একটি কাক এসে থাকছে। তাই সে কাকের জন্যও একটি ঝাড়ি টাঙিয়ে দিল। সেই থেকে কাকটিও সেই বাড়িতে থাকতে লাগল।

একদিন শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে প্রচুর মাছ, মাংস এল। তা দেখে কাকের খুব লোভ হল। সে ঠিক করল পরদিন সে খাবার খুঁজতে বাইরে যাবে না। এই ভেবে সে সারারাত অসুস্থতার ভান করে পড়ে রইল। সকালে সে বলল, বোধিসত্ত্বের সঙ্গে খাবার খেতে বাইরে যাবে না। বোধিসত্ত্বের মনে সন্দেহ হল। তাই তিনি কাককে বললেন, বেশ, তুমি থাক। তবে সাবধান, লোভে পড়ে কোনো কিছু করে বোসো না। কাককে উপদেশ দিয়ে বোধিসত্ত্ব নিজের খাবার খুঁজতে চলে গেলেন।

এদিকে পাচক রান্না শুরু করল। রান্নার হাঁড়ি থেকে বাষ্প বেরিয়ে যাবার জন্য হাঁড়ির মুখ একটু খোলা রাখল। একটা হাঁড়ির ওপর ঝাঁঝি দিয়ে ঢেকে রাখল। রান্নার সুগন্ধে চারদিক ম ম করতে লাগল। এ সময় পাচক গায়ের ঘাম শুকাবার জন্য রান্নাঘরের বাইরে বারান্দায় গেল। কাক ঠিক সময় বুঝে ঝুড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁড়ির ওপর ঝাঁঝিতে গিয়ে বসল। অমনি ঝাঁঝিটা মাটিতে পড়ে ঝন ঝন শব্দ হল। পাচক সেই শব্দ শুনে ব্যাপার কী জানার জন্য রান্নাঘরে ছুটে এল।

এসে দেখল কাককে। পাচক সঙ্গে সঙ্গে ধূর্ত কাকের উদ্দেশ্য বুঝতে পারল। সে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দরজা ও জানালা বন্ধ করে কাকটিকে ধরল। সারা শরীরের পালক একে একে তুলল। গায়ে আদা ও নুন মেখে দিল। তারপর তাকে ঝুড়ির মধ্যে ফেলে রাখল। যন্ত্রণায় কাক ছটফট করতে লাগল।

বোধিসত্ত্ব সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে কাককে দেখে সব বুঝতে পারলেন। তখন তিনি ভাবলেন, লোভী কাক আমার কথা না শুনে এই ফল পেয়েছে। তারপর তিনি একটি গাথা বললেন। গাথাটির অর্থ হল—

উপকারী বন্ধুর কথা স্বেচ্ছাচারীরা শোনে না। এ জন্য তার ওপর বিপদ নেমে আসে। কাক তার প্রমাণ। বোধিসত্ত্ব এই গাথা আবৃত্তি করে নিজে নিজে বললেন, আমিও আর এখানে থাকতে পারি না। তারপর তিনি সেখান থেকে অন্য জায়গায় চলে গেলেন।

কাক সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল। পাচক ঝুড়িসহ কাককে ফেলে দিল।

উপদেশ : লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

দেবধর্ম জাতক

পুরাকালে বারাণসী রাজ্যে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। সেসময় বোধিসত্ত্ব রাজকুমার রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম হল মহিৎসাসকুমার। তাঁর দু-তিন বছর বয়সে এক ছোট ভাই জন্মাল। তাঁর নাম হল চন্দ্রকুমার। চন্দ্রকুমার একটু বড় হলে রানী পরলোক গমন করেন। রাজা ব্রহ্মদত্ত তখন আর একবার বিবাহ করেন। কিছু দিন পর ছোট রানীর এক ছেলে হল। সেই ছেলের নাম রাখা হল সূর্যকুমার। রাজা তখন খুব খুশি হয়ে রানীকে বর দিতে চাইলেন। রানী তখন কোনো বর নিলেন না। তিনি বললেন, মহারাজ, এখন থাক, পরে আমি এই বর চেয়ে নেব।

সূর্যকুমার বড় হল। রানী তখন রাজাকে বললেন, সূর্যকুমারের জন্মের সময় আপনি আমাকে একটি বর দিতে চেয়েছিলেন। এখন সেই বর আমাকে দিন। আমার ছেলেকে রাজা করে নিন। ব্রহ্মদত্ত বললেন, আমার বড় দুই ছেলে আগুনের মতো তেজস্বী। আমি তাদের বদলে ছোট কুমারকে রাজা করতে পারি না। রানী কিন্তু এ কথায় শান্ত হলেন না। তিনি দিনরাত রাজাকে এই নিয়ে বিরক্ত করতে লাগলেন। রাজাও এতে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি আশংকা করলেন, রানীর চক্রান্তে বড় দুই কুমারের ক্ষতি হতে পারে।

এই ভেবে রাজা বড় দুই কুমারকে ডেকে বললেন, ছেলেরা আমার, তোমাদের ছোট ভাইয়ের জন্মের সময় ছোট রানীকে আমি একটি বর দিতে চেয়েছিলাম। সেই বরে এখন তিনি সূর্যকুমারকে রাজা করতে চান। কিন্তু সে রাজা হোক তা আমি চাই না। আমার আশংকা ছোট রানী এজন্য তোমাদের ক্ষতি করতে পারে। তোমরা এখন বনে গিয়ে আশ্রয় নাও। আমার মৃত্যুর পর নিয়ম অনুযায়ী বড় ছেলে রাজত্ব পাবে। তখন তোমরা সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিও— এই বলে তিনি বড় দুই ছেলেকে বিদায় দিলেন।

দুই কুমার পিতার আদেশে রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়ল। প্রাসাদের বাইরে তখন সূর্যকুমার খেলছিল। দুই ভাইয়ের মুখ থেকে বনে যাওয়ার কথা শুনে সেও ভাইদের সঙ্গে চলল। চলতে চলতে তিন ভাই হিমালয় পর্বতে পৌঁছল। সেখানে বোধিসত্ত্ব এক গাছের তলায় বসে সূর্যকুমারকে বললেন, ওই সরোবরে গিয়ে স্নান করে এসো। জল খেয়ে এসো। আসার সময় পদ্মপাতায় করে আমাদের জন্য জল এনো।

সেই সরোবরে এক জলরাক্ষস থাকত। জলরাক্ষস সরোবরটি পেয়েছিল এক কুবেরের কাছ থেকে। দেওয়ার সময় কুবের তাকে বলেছিলেন, দেবধর্মজ্ঞানহীন কোনো লোক যদি এই সরোবরে নামে একমাত্র তাকেই তুমি খেতে পারবে। কিন্তু জলে না নামলে তাকে তুমি খেতে পারবে না। সূর্যকুমার এসব কিছুই জানত না। সে জলে নামতেই জলরাক্ষস তাকে ধরে বলল, দেবধর্ম কাকে বলে জান? সূর্যকুমার বলল, জানি, লোকে সূর্য ও চাঁদকে দেবতা বলে। রাক্ষস বলল, মিথ্যে কথা। তুমি দেবধর্ম কী জানো না—এই বলে সে সূর্যকুমারকে টেনে নিজের ঘরে নিয়ে বেঁধে রাখল।

সূর্যকুমার ফিরে আসতে দেরি করছে দেখে বোধিসত্ত্ব চন্দ্রকুমারকে ছোট ভাইয়ের খোঁজে পাঠালেন। জলরাক্ষস চন্দ্রকুমারকেও প্রশ্ন করল দেবধর্ম কী? চন্দ্রকুমার যে উত্তর দিল, জলরাক্ষস তাতে সন্তুষ্ট হতে পারল না। তাই চন্দ্রকুমারকেও নিজের ঘরে নিয়ে বেঁধে রাখল।

চন্দ্রকুমার ফিরে আসছে না দেখে বোধিসত্ত্ব বুঝলেন দুই ভাই কোনো বিপদে পড়েছে। তাঁর সন্দেহ হল ওই সরোবরে কোনো জলরাক্ষস আছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তীর, ধনুক ও তরবারি নিয়ে সরোবরের কূলে রাক্ষসের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। রাক্ষস দেখল, বোধিসত্ত্ব জলে নামছেন না। তখন সে বনবাসী মানুষ সেজে বোধিসত্ত্বের সামনে এসে বলল, ভাই, আপনি দেখছি পথের কষ্টে ক্লান্ত। সামনে চমৎকার সরোবর। ওখানে নেমে স্নান করুন। জল পান করুন। তাতে আপনার ক্লান্তি কেটে যাবে।

বোধিসত্ত্ব জলরাক্ষসকে চিনতে পারলেন। জলরাক্ষসও উপায় না দেখে বোধিসত্ত্বের কাছে সব কথা স্বীকার করল। তখন বোধিসত্ত্ব বললেন, দেবধর্ম কী তা আমি জানি। তুমি আমার কাছ থেকে তা জানতে চাও?

রাক্ষস বলল, হ্যাঁ চাই।

বোধিসত্ত্ব বললেন, বলব। তবে পথশ্রমে আমি খুব ক্লান্ত। আগে আমি সুস্থ হই। তখন রাক্ষস তাঁকে স্নান করতে দিল। খাদ্য ও পানীয় দিল। বসবার জন্য বিচিত্র আসন সাজিয়ে তাতে বসতে দিল। বোধিসত্ত্ব সেই আসনে বসলেন। রাক্ষস তাঁর পায়ে কাছ বসল। তখন বোধিসত্ত্ব বললেন, শান্ত, সত্যপরায়ণ ও নির্মল অন্তরে যিনি ধর্মকাজ করেন তিনি দেবধর্মপরায়ণ। মনে পাপ জাগলে যিনি নিজে নিজে লজ্জা পান তিনি দেবধর্মপরায়ণ।

এই ব্যাখ্যা শুনে রাক্ষস সন্তুষ্ট হয়ে বলল, আপনি পণ্ডিত। আমি আপনার কথায় সন্তুষ্ট হলাম। আমি আপনাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আপনার একজন ভাইকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। বলুন, কাকে আনব? বোধিসত্ত্ব বললেন, আমার ছোট ভাইকে।

রাক্ষস বলল, আপনি দেবধর্ম জানেন। অথচ সেই অনুসারে কাজ করছেন না। মেজ ভাইয়ের বদলে ছোট ভাইকে চাইছেন কেন?



তিন রাজকুমার বনের দিকে যাচ্ছে

আমি দেবধর্ম জানি এবং সেই অনুসারে কাজও করি। সবচেয়ে ছোট ভাইটি আমার সৎ ভাই। ওর জন্য আমরা বনবাসী হয়েছি। আমার বিমাতা ওকে রাজা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পিতা তাতে রাজি হননি। আমাদের ছোট ভাইটিও সব শূনে আমাদের সঙ্গে বনবাসী হয়েছে। আমাদের ফেলে সে একদিনও রাজপুরীতে ফেরার কথা ভাবেনি। এখন ফিরে গিয়ে আমি যদি বলি তাকে রাক্ষস খেয়েছে তা কেউ বিশ্বাস করবে না। এ জন্য আমি তাকে চাইছি।

রাক্ষস খুশি হয়ে দুই ভাইকে ফিরিয়ে দিল। তখন বোধিসত্ত্ব রাক্ষসকে বললেন, তুমি অতীত জন্মে পাপ করেছিলে বলে রাক্ষস হয়েছ। এতেও তোমার শিক্ষা হয়নি। এ জন্মেও তুমি পাপ করছ। এর ফলে তুমি মৃত্যুর পর নরকে থাকবে। কষ্ট পাবে। সুতরাং এখন থেকে সৎ পথে চলে এসো। তাহলে তুমি মুক্তি পাবে।

এভাবে জলরাক্ষসকে সৎ পথে এনে বোধিসত্ত্ব বনে বাস করতে লাগলেন। তারপর একদিন পিতার মৃত্যুর খবর পেয়ে রাজ্যে ফিরে গেলেন। তিনি বারাণসীর রাজা হলেন। চন্দ্রকুমারকে করলেন উপরাজ। সূর্যকুমারকে দিলেন সেনাপতির পদ। রাক্ষসের জন্য সুন্দর ঘর ও সুখের ব্যবস্থা করলেন। এভাবে রাজধর্ম পালন করে তিনি পরলোক গমন করলেন। পুণ্যবলে তিনি স্বর্গে গেলেন।

উপদেশ : ধর্মপথে চললে জয় অনিবার্য।

বেণুক জাতক

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব এক মহাসম্পদশালী কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বড় হওয়ার পর তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কামনাতেই দুঃখ, বৈরাগ্যেই প্রকৃত সুখ। কাজেই তিনি কামনা ত্যাগ করে হিমালয়ে গিয়ে ঋষির জীবন গ্রহণ করলেন। সেখানে ধ্যান ও সাধনা করে তিনি পাঁচ রকম অলৌকিক শক্তি এবং আট রকম ধ্যানফলের

অধিকারী হন। পাঁচশত তপস্বী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই পাঁচশত শিষ্যকে তিনি শিক্ষা দিতেন।

একদিন এক বিষাক্ত সাপের ছানা ঘুরতে ঘুরতে এক তপস্বীর আশ্রমে উপস্থিত হল। ওই সাপের ছানার ওপর তপস্বীর ছেলের মতো স্নেহ জন্মাল। তিনি তাকে একটি বাঁশের নলের মধ্যে রেখে লালনপালন করতে লাগলেন। বাঁশের নল বা বেগুর মধ্যে থাকত বলে তার নাম ‘বেগুক।’ ছেলের মতো লালন করত বলে তপস্বীকে সবাই ‘বেগুক পিতা’ বলে ডাকত।

শিষ্যদের মধ্যে একজন সাপ পুষছে শুনে বোধিসত্ত্ব তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি সাপ পুষছ, একথা কি সত্য? তপস্বী বললেন, হ্যাঁ, গুরুদেব।

সাপকে বিশ্বাস নেই। তুমি তাকে আর রেখ না। তপস্বী বললেন, গুরু যেমন শিষ্যকে ভালোবাসে তেমনি আমিও এই সাপকে ভালোবাসি। আমি তাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

বোধিসত্ত্ব বললেন, আমি দেখতে পাচ্ছি এই সাপের ছোবলে তোমার প্রাণ যাবে।

তপস্বী বোধিসত্ত্বের কথায় কান দিলেন না, সাপকেও ছাড়লেন না।

কিছুদিন পরে আশ্রমের সব তপস্বী বনের ফল সংগ্রহে বের হলেন। এক জায়গায় প্রচুর ফল পাওয়া গেলে তাঁরা সেখানে দু তিন দিন থেকে গেলেন। বেগুকের বাবা বেগুককে বাঁশের নলে আটকে রেখে তপস্বীদের সঙ্গে গিয়েছিলেন। দু তিন দিন পরে তিনি আশ্রমে ফিরে এসে বেগুককে খাওয়াতে গেলেন। বাঁশের নলের মুখ খুলে তিনি বললেন, এসো বাছা, তোমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে, খাবে এসো— এই বলে তিনি বাঁশের নলের মুখ খুলে বেগুকের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

অমনি ক্ষুধার্ত সাপ তপস্বীর হাতে ছোবল মারল। তপস্বীর মৃত্যু হল। সাপ বনের ভিতরে চলে গেল। বেগুকের পিতাকে মৃত দেখে তপস্বীরা বোধিসত্ত্বকে খবর দিলেন। বোধিসত্ত্ব শবদাহের আদেশ দিলেন। দাহ শেষ হল। তারপর তিনি ঋষিদের ডেকে উপদেশ দেওয়ার জন্য এই গাথাটি বললেন :

হিতপরায়ণ বন্ধুর বচন

স্বেচ্ছাচারী না করে শ্রবণ।

অর্থাৎ উপকারী বন্ধুর কথা স্বেচ্ছাচারীরা শোনে না।

বোধিসত্ত্ব ধ্যানসাধনা করে পরিণত বয়সে পরলোকে গমন করলেন। পুণ্যের ফলে তিনি স্বর্গে গেলেন।

উপদেশ : বিষধর সাপ মানুষের বন্ধু হওয়ার উপযুক্ত নয়।

বনুপথ জাতক

পুরাকালে বারাণসী নগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। সেসময় বোধিসত্ত্ব এক বণিকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। বোধিসত্ত্ব বড় হয়ে পাঁচশত গাড়ি নিয়ে নানা জায়গায় বাণিজ্য করতেন।

ব্যবসা উপলক্ষে একবার বোধিসত্ত্ব ষাট যোজন বিস্তৃত এক মরু অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছেন। সেই মরুভূমির বালি এত মিহি ছিল যে তা হাতের মুঠোয় ধরে রাখা যেত না। আঙুলের ফাঁক দিয়ে সে বালি গলে পড়ে যেত। সূর্য ওঠার পর সেই

বালুরাশি জ্বলন্ত কয়লার মতো গরম হয়ে উঠত। তখন সেই মরুভূমির ওপর দিয়ে কারও পক্ষে চলাফেরা করা সম্ভব হত না। সেই ভীষণ মরুপথ পার হত রাতে, দিনে নিতে হত বিশ্রাম। ব্যবসায়ীরা সঙ্গে জল, তেল, চাল ও লাকড়ি ইত্যাদি রাখত। সূর্য উঠলে যাত্রা বন্ধ করে বলদগুলো গাড়ি থেকে খুলে দিত। গাড়িগুলো গোল করে সাজিয়ে নিয়ে মাঝখানে সামিয়ানা খাটিয়ে নিত। সকাল সকাল রান্নাবান্না করে খেয়ে সামিয়ানার নিচে দিন কাটাত।

আবার যখন সূর্য ডুবতে বসত তখন তাড়াতাড়ি রান্না করে খেয়ে নিয়ে আবার যাত্রা শুরু করত। নাবিকরা যেমন সমুদ্রে চলার সময় নক্ষত্র দেখে দিক নির্ণয় করে, তেমনি মরুভূমিতে চলার সময় পথ প্রদর্শকরা নক্ষত্র দেখে পথ চিনে নিত। বোধিসত্ত্ব একদিন সেই মরুভূমির উনষাট যোজন পথ অতিক্রম করে গেলেন। তারপর তিনি ভাবলেন, বাকি এক যোজন পথও রাতের মধ্যে পার হয়ে যাবেন। এই ভেবে তিনি সন্ধ্যার পর জল, কাঠ ইত্যাদি অনেক জিনিস দরকার নেই দেখে ফেলে দিতে বললেন। এতে বোঝা হালকা হবে এবং মরুভূমি পার হয়ে গেলে সেসব জিনিস সব জায়গায় পাওয়াও যাবে। এভাবে তাঁরা চলতে শুরু করলেন। যে গাড়িখানা দলের আগে চলছে তাতে বসা ছিল পথ প্রদর্শক। তিনি নক্ষত্র দেখে পথ চিনিয়ে দিচ্ছিলেন।

দীর্ঘদিন মরুভূমির মধ্য দিয়ে চলতে চলতে পথ প্রদর্শকের ভালো ঘুম হচ্ছিল না। সেই রাতে তার চোখ জুড়ে ঘুম এল। বলদগুলোও আপন খেয়ালে উল্টো দিকে চলতে শুরু করল। সারারাত এভাবে সব গাড়ি চলল। ভোর হওয়ার আগে আগে পথ প্রদর্শকের ঘুম ভাঙল। আকাশের দিকে তাকিয়ে সে তাড়াতাড়ি বলল, গাড়ি ঘোরাও, গাড়ি ঘোরাও। সমস্ত গাড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে সূর্য ওঠার সময় হয়ে গেল। সবাই দেখল আগের সন্ধ্যায় তারা যেখান থেকে যাত্রা করেছিল ঠিক সেই জায়গাতেই তারা আবার ফিরে এসেছে। তখন সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ল। গাড়িতে জল নেই, কাঠ নেই। উপায় কী হবে? উপায় না দেখে তারা বলদগুলো খুলে দিয়ে গাড়ি জড়ো করে সামিয়ানা খাটিয়ে হতাশ হয়ে শূয়ে পড়ল।

বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, আমি চেষ্টা করে উপায় খুঁজে বের না করলে সবাই মারা যাবে। ভোরের সময় ঠান্ডায় ঠান্ডায় একবার চারদিকে ঘুরে দেখি, কোথাও জল পাওয়া যায় কিনা! এই ভেবে চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় এক গুচ্ছ ঘাস দেখতে পেলেন। এতে তিনি বুঝতে পারলেন যে ওই জায়গায় নিশ্চয়ই জল আছে। নতুবা সেখানে ঘাস জন্মাতে পারত না। তখন তিনি তাঁর অনুচরদের কোদাল দিয়ে সেখানে খুঁড়তে আদেশ দিলেন। খুঁড়তে খুঁড়তে ষাট হাত নিচে একটা পাথরে কোদালের কোপ পড়ে ঠং করে শব্দ হল। বোধিসত্ত্ব নিচে নেমে পড়লেন। তিনি পাথরের ওপর কান পেতে শুনতে পেলেন নিচে জলের শব্দ হচ্ছে। তখন তিনি উপরে উঠে চাকর বালককে বললেন, তুমি নিচে নাম। বড় হাতুড়িটা দিয়ে পাথর ভাঙার চেষ্টা কর।

বালক চাকরটি খুব উৎসাহী ও উদ্যমী ছিল। সে দ্বিধা না করে প্রভুর আদেশ মতো পাথরের ওপর হাতুড়ির ঘা দিতে লাগল। তাতে পাথর ভেঙে গেল। অমনি ভিতরের জল উপর দিকে ছিটকে বেরিয়ে এল। সবাই মহাখুশিতে স্নান করল, জল পান করল। তারপর গাড়িতে যে সব বাড়তি চাকা ও কাঠের সরঞ্জাম ছিল সেগুলো চেরাই করল। আগুন জ্বালল।

রান্নাবান্না করল। গরুগুলোকে খাইয়ে দাইয়ে চাঙা করে তুলল। তারপর কুয়োর পাশে একটা পতাকা পুঁতে দিল যাতে দূর থেকে পতাকাটি দেখে অন্য বণিকরা সহজে কুয়োটি চিনতে পারে। রাত নামলে তাঁরা মরুভূমি পাড়ি দিলেন। রাতের শেষে গন্তব্য স্থানে পৌঁছালেন। সেখানে বেচাকেনা করে বোধিসত্ত্বের অনেক লাভ হল। তারপর দেশে ফিরে এসে সুখে বাস করতে লাগলেন। বোধিসত্ত্ব পরিণত বয়সে পরলোক গমন করে স্বর্গে গেলেন।

উপদেশ : বিপদে অধীর না হয়ে উদ্ভাবনের পথ খোঁজা উচিত।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১-৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

শিক্ষক ক্লাসে জাতক সম্পর্কে পড়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম জাতকে বেণুক জাতক সম্পর্কে বর্ণনা দেন। দেবধর্ম জাতকে মহিংসাসকুমার ও জলরাক্ষসের সম্পর্কের কথা বলেন। তাছাড়া ক্লাসে বেণুক জাতকের বিষধর সাপের কাহিনী বিশেষভাবে আলোচিত হয়।

১. 'দেবধর্ম' বলতে বুঝায়-

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| ক. শান্ত, সত্যপরায়ণ, নির্মল চিত্ত | খ. শান্ত, অটল, স্থিরচিত্ত |
| গ. শান্ত, শিক্ষিত, অবিচলচিত্ত | ঘ. শান্ত, সত্যবাদিতা ও বিমলচিত্ত |

২. ছোট রানীর ছেলের নাম কী রাখা হয়?

- | | |
|---------------|----------------|
| ক. দেবকুমার | খ. নবকুমার |
| গ. সূর্যকুমার | ঘ. চন্দ্রকুমার |

৩. বোধিসত্ত্ব তার দুই ভাইকে জলরাক্ষসের নিকট থেকে উদ্ধার করার জন্য যে ব্যবস্থা নিলেন এতে তুমি কী উপদেশ পেলে?

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| ক. দেবধর্ম জ্ঞান লাভ | খ. মানবধর্ম জ্ঞান লাভ |
| গ. সত্যধর্ম জ্ঞান লাভ | ঘ. কুশলধর্ম জ্ঞান লাভ |

৪. ধর্মপথে চললে জয় অনিবার্য- এ বাণীটির ব্যাখ্যায় আমরা কী মতামত পেতে পারি?

- সৎপথে মুক্তি অন্বেষণ করা যায়
- রাজধর্ম পালন করা যায়
- পুণ্য বলে স্বর্গ লাভ করা যায়

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|--------|------------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i, ii এবং iii |

৫. বেণুক জাতকে বোধিসত্ত্ব কতজন শিষ্যকে শিক্ষা দিতেন?

- | | |
|----------|-----------|
| ক. একশত | খ. তিনশত |
| গ. চারশত | ঘ. পাঁচশত |

৬. 'কামনাতেই দুঃখ বৈরাগ্যেই প্রকৃত সুখ'-এ ভেবে কামনা ত্যাগ করে কিসের অধিকারী হন?

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| ক. অলৌকিক শক্তি ও ধ্যানফলের অধিকারী | খ. দিব্যশক্তি ও জ্ঞানশক্তির অধিকারী |
| গ. পরাশক্তি ও মানবশক্তির অধিকারী | ঘ. ধ্যান শক্তি ও ত্যাগশক্তির অধিকারী |

৭. বোধিসত্ত্ব তপস্বীকে বিষধর সাপ না পুষে ছেড়ে দিত বললেন কিন্তু সে কর্ণপাত করল না। এতে তার-

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| ক. প্রাণ দিতে হল | খ. প্রাণের আশা মিটালো |
| গ. প্রাণ দিয়ে স্বর্গে গেল | ঘ. প্রাণ ফিরে গেল |

৮. বিষধর সাপ মানুষের বন্ধু হওয়ার উপযুক্ত নয়। এ বাণীটি প্রমাণ করে যে উপদেশ পাই-

- হিংস্র প্রাণীরা ক্ষতি করতে সদা প্রস্তুত
- বিষধর প্রাণী মাত্রই অন্যকে ধ্বংস করে
- হিংস্র প্রাণীরা অন্য প্রাণীদের ধ্বংস করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|--------|------------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i, ii এবং iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১ ও ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও-

সুমনা বনুপথ জাতকের কাহিনী পড়ে জানল যে পুরাকালে বোধিসত্ত্ব, বণিকের ঘরে জন্মগ্রহণ করে পাঁচশত গাড়ি নিয়ে তার সহচরীদের সাথে মরুভূমির পথ অতিক্রম করে ব্যবসা করতেন। তারা নক্ষত্র দেখে পথ চিনিয়ে নিতেন, তাও সে জানতে পারল।

- বোধিসত্ত্ব ও তার অনুচরেরা কত যোজন পথ অতিক্রম করে ব্যবসা করত?

ক. ষোল যোজন।	খ. ছাব্বিশ যোজন।
গ. উনত্রিশ যোজন।	ঘ. উনষাট যোজন।
- বোধিসত্ত্ব ও অনুচরেরা ভীষণ মরুপথ দিনে পার না হয়ে রাতে পার হল কারণ ছিল-
 - অত্যন্ত উত্তপ্ত গরম
 - জ্বলন্ত কয়লার মতো গরম
 - অসহনীয় উত্তপ্ত গরম

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------|------------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i, ii এবং iii |

- বোধিসত্ত্বের বুদ্ধিতে সবাই প্রাণভরে পানি পান করতে পারল। বুদ্ধি থাকলে উপায় হয় বোধিসত্ত্বের এই কথাটি থেকে বুদ্ধির যে কৌশল তারা পায় তা হল-

ক. ঘাসের সন্ধান পাওয়া	খ. কাদামাটির সন্ধান পাওয়া
গ. পাথরের সন্ধান পাওয়া	ঘ. গাছের সন্ধান পাওয়া
- বিপদে অধীর না হয়ে উদ্ভারের পথ খোঁজা উচিত এই উপদেশ বাণীতে তোমার ভূমিকা হবে-

ক. বুদ্ধি দিয়ে বিপদের মোকাবেলা করা	খ. বুদ্ধি দিয়ে বিচার করা
গ. বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করা	ঘ. বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করা

সৃজনশীল প্রশ্ন

- প্রত্যেকটি জাতকের কয়েকটি মূল অংশ আছে। অমল মার্মা ধর্ম বইয়ের জাতকের কাহিনীগুলো থেকে বুঝতে পেরেছে যে, এখানে শুধু অতীত জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বেণুক জাতকের মধ্যে বিষধর অকৃতজ্ঞ সাপের গল্প চমৎকারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্বের ধ্যানসাধনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ক. জাতকের মূল অংশ কয়টি?
খ. তপস্বীকে কেন বেণুক পিতা বলে ডাকা হত?
গ. অকৃতজ্ঞ বিষধর সাপের প্রতিপালনের ক্ষেত্রে হিতপরায়ণ বান্দুর উপদেশ অমান্য করার পরিণতি বর্ণনা কর।
ঘ. বেণুক জাতকের কাহিনী থেকে যে শিক্ষা পেলে সে সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।
- সুভদ্র চৌধুরী ধর্ম বই থেকে জাতক সম্বন্ধে ভালোভাবে পড়েছে। সে বুঝতে পেরেছে বুদ্ধ হতে হলে অনেকবার বোধিসত্ত্ব হিসেবে নানাকূলে জন্মগ্রহণ করতে হয়। জাতক সাধারণ গল্প থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সে দেবধর্ম জাতকের কাহিনী পড়ে চমৎকৃত হয়েছে। এ কাহিনী থেকে বুঝতে পেরেছে ধর্মপথে চললে জয় অনিবার্য।

- ক. বোধিসত্ত্ব গৌতমরূপে জন্মগ্রহণের পূর্বে কতবার জন্মগ্রহণ করেছিলেন?
- খ. কীভাবে বুদ্ধ হওয়া যায়?
- গ. জাতক ও সাধারণ গল্পের মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়ে লেখ।
- ঘ. ‘ধর্মপথে চললে জয় অনিবার্য’ দেবধর্ম জাতকে বর্ণিত এ শিক্ষার সাথে তুমি কি একমত? বুঝিয়ে লেখ।
৩. শিক্ষক ক্লাসে জাতকের কাহিনীতে জন্ম জন্মান্তরের সাধনা, দান, শীল ইত্যাদির দ্বারা পারমী পূর্ণ করতে হয় তা পড়াচ্ছিলেন। তিনি কপোত জাতকে, পুরাকালে বোধিসত্ত্ব পায়রা রূপে জন্মগ্রহণ করা, বোধিসত্ত্ব ও কাকের মধ্যে চারিত্রিকভাবে যে পার্থক্য রয়েছে তাও বর্ণনা করেন। পরে এই জাতকের কাহিনীতে লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু এ সত্যটি বুঝিয়েছেন। তাছাড়া উপকারীর কথা স্বেচ্ছাচারী বন্ধু শোনে না তাও জাতকে বলা আছে।
- ক. জাতক পাঠ করলে কী সম্পর্কে ধারণা জন্মে?
- খ. কাক একদিন বোধিসত্ত্বের সাথে আহারের খোঁজে গেল না কেন?
- গ. ‘উপকারী বন্ধুর কথা স্বেচ্ছাচারীরা শোনে না’-এ বক্তব্যটি অবলম্বনে তুমি কী শিক্ষা লাভ করেছ?
- ঘ. ‘লোভে পাপ পাপে মৃত্যু’-এ বাণীটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

দশম অধ্যায়

প্রথম বৌদ্ধ মহাসংগীতি

‘সংগীতি’ শব্দের অর্থ সম্মেলন বা সমাবেশ। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে সংগীতিকে সঙ্ঘায়নও বলা হয়ে থাকে। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভের পর বুদ্ধের বাণী, উপদেশ, ধর্ম ও বিনয় সংকলন করার জন্য মহাসম্মেলন আহ্বান করা হয়। এ ছাড়া ধর্ম ও বিনয় সম্পর্কে কোনো সমস্যা দেখা দিলে সংগীতি আহ্বান করা হত। শত শত প্রবীণ, জ্ঞানী, অর্হৎ ভিক্ষু সেখানে উপস্থিত থাকতেন। বুদ্ধের বাণী, ধর্ম, বিনয় ইত্যাদি পর্যালোচনা করে ভিক্ষুরা একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এসব সম্মেলন সংগীতি নামে পরিচিত।

গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভের তিন মাস পরে রাজগৃহের নিকটবর্তী সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। এই সংগীতিই প্রথম বৌদ্ধ মহাসংগীতি। এই মহাসংগীতিতে পাঁচশত অর্হৎ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। এজন্য এ মহাসংগীতিকে পঞ্চাশতিকা সংগীতিও বলা হয়। এই সংগীতি শেষ হতে দীর্ঘ চার মাস সময় লেগেছিল।

প্রথম মহাসংগীতি আহ্বানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বুদ্ধের বাণী, উপদেশ, ধর্ম ও বিনয় সংগ্রহ ও সংকলন করা। গৌতম বুদ্ধ দীর্ঘ ৪৫ বছর বিভিন্ন স্থানে ধর্ম প্রচার করেছেন। এ সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে ভিক্ষুসঙ্ঘ ও সাধারণ মানুষকে দিয়েছেন অনেক উপদেশ। বলেছেন অনেক সূত্র। ধর্ম সম্পর্কে দিয়েছেন নানা ব্যাখ্যা। প্রবর্তন করেছেন ভিক্ষুসঙ্ঘের নানা নিয়মকানুন। এ সবই বুদ্ধ মুখে মুখেই বলেছিলেন। ফলে তাঁর বাণী অসংখ্য শিষ্যের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নেতৃস্থানীয় শিষ্যবর্গ ভাবতেন এসব ছড়ানো ছিটানো সূত্র ও বিনয়ের উপদেশ সংগ্রহ করা দরকার। নতুবা পরবর্তীতে এ নিয়ে নানা তর্কবিতর্কের সৃষ্টি হবে। এই আশংকায় বুদ্ধের শিষ্যগণ প্রথম মহাসংগীতির ব্যবস্থা করেন।

প্রথম মহাসংগীতি আহ্বানের অন্য একটি কারণও ছিল। বুদ্ধ যখন মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন তখন নেতৃস্থানীয় মহাকাশ্যপ স্থবির কুশীনগরে ছিলেন না। পাবা থেকে কুশীনগর যাওয়ার পথে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভের খবর পান। খবর শুনে উপস্থিত সকলেই মর্মান্বিত হলেন। কিন্তু সুভদ্র নামে একজন অবিদিত ভিক্ষু হঠাৎ বলে উঠলেন, ভিক্ষুগণ, কেন আপনারা অনর্থক অনুশোচনা করছেন? বুদ্ধের জীবিতাবস্থায় সঙ্ঘের যাবতীয় বিনয়নীতি মেনে চলতে হত। এখন আমাদের যা খুশি তা করব।

এ ঘটনায় মহাকাশ্যপ ও অন্যান্য শ্রদ্ধাবান ভিক্ষু খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাঁরা ভাবলেন বুদ্ধের মরদেহ এখনও বর্তমান। এখনই যদি ভিক্ষুসঙ্ঘে অনিয়ম ও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেয় তাহলে সমূহ বিপদ। এভাবে চলতে থাকলে অচিরেই বুদ্ধশাসন পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যাবে। তাই বুদ্ধের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কয়েকদিন পরেই নেতৃস্থানীয় প্রবীণ ও জ্ঞানী ভিক্ষুরা এ সম্মেল্লে আলোচনার জন্য সমবেত হন। তাঁরা সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিলেন যে অর্হৎ ভিক্ষুদের নিয়ে একটি সম্মেলন করতে হবে। কিন্তু এই সম্মেলনের জন্য প্রচুর অর্থ ও পরিশ্রম প্রয়োজন। তাঁদের চিন্তা হল কে এত অর্থের যোগান দেবে? এসময়ে মগধের রাজা ছিলেন অজাতশত্রু। তিনি প্রথমে বুদ্ধের ঘোর বিরোধী ছিলেন। পরে তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন ও বুদ্ধের একনিষ্ঠ সেবক হন। নেতৃস্থানীয় কয়েকজন ভিক্ষু রাজা অজাতশত্রুর কাছে উপস্থিত হয়ে সংগীতির কথা বলেন। রাজা তাতে সবিনয়ে সম্মতি দান করেন।

রাজা অজাতশত্রুর সৌজন্যে রাজগৃহের সন্তপর্ণী গুহায় প্রথম মহাসংগীতির অধিবেশন বসে। রাজার অর্থে গুহার সামনে বিশাল মণ্ডপ তৈরি হয়। এতে পঁচাত্তর অর্হৎ ভিক্ষুর আসন সজ্জিত হয়। মাঝখানে রাখা হয় ধর্মাসন। স্থবির আনন্দ তখনও অর্হৎ ফল লাভ করতে পারেননি। তবুও বুদ্ধের স্থায়ী সেবক ও শ্রুতিধর হিসেবে মণ্ডপে তাঁর জন্য একটি আসন রাখা হয়। নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে সকল ভিক্ষু উপস্থিত হলেন। সবাই দেখলেন একমাত্র স্থবির আনন্দ ছাড়া অন্য সকলেই উপস্থিত আছেন। এসময় হঠাৎ সকলে লক্ষ করলেন স্থবির আনন্দ তাঁর আসনে বসে আছেন। সম্মেলন শুরুর মুহূর্তেই তিনি অর্হৎ ফল লাভ করেছিলেন। তিনি তখন নিজ শক্তি বলে অলৌকিকভাবে নিজ আসন অধিকার করেন। তাই সকলে স্থবির আনন্দকে দেখে খুশি হয়ে সাধুবাদ জানালেন।

সর্বসম্মতিক্রমে এই সংগীতির সভাপতি নির্বাচিত হন মহাকাশ্যপ স্থবির। শুধু তাই নয়, তিনি প্রশ্নকর্তাও নির্বাচিত হন। সভায় সিদ্ধান্ত হয় প্রথমে বিনয় সঙ্ঘায়ন হবে। উপালি স্থবির ছিলেন বিনয়ধর। বুদ্ধই তাঁকে এই উপাধি দিয়েছিলেন। মহাকাশ্যপ স্থবির উপালি স্থবিরকে ধর্মাসনে বসিয়ে বিনয় সম্পর্কে যাবতীয় প্রশ্ন করলেন। উপস্থিত ভিক্ষুসঙ্ঘ শুনলেন। তারপর বিভিন্ন প্রশ্ন করলেন। উপালি স্থবির ধীরস্থিরভাবে একে একে সকল প্রশ্নের উত্তর দিলেন। এভাবে পঁচাত্তর অর্হৎ ভিক্ষুর অনুমোদন লাভের পর বিনয় সংগ্রহ শেষ হয়।

বিনয়ের পর ধর্ম সংগ্রহ শুরু হয়। এবারেও মহাকাশ্যপ স্থবির নিজে প্রশ্নকর্তা। শ্রুতিধর আনন্দ স্থবিরকে তিনি আহ্বান করলেন। আনন্দ স্থবির ধর্মাসনে বসলেন। তাঁকে ব্রহ্মজাল, শ্রামণ্যফল, দীর্ঘ নিকায়, মধ্যম নিকায় প্রভৃতি সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করা হয়। তিনি সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তারপর সেগুলো সকলের অনুমোদন লাভ করে। এভাবে সূত্র পিটক সংগৃহীত হল।

প্রথম সংগীতিতে অভিধর্ম পিটকের উল্লেখ ছিল না। অভিধর্ম ধর্মের সাথে যুক্ত ছিল।

আমরা এখন প্রথম মহাসংগীতির ঐতিহাসিক গুরুত্ব কতটুকু তা আলোচনা করব। অনেকে মনে করেন সুভদ্র ভিক্ষুর অসৎ আচরণের জন্য, মহাকাশ্যপ মহাসংগীতি আহ্বান করার কথা বলেছিলেন। মহাপরিনির্বাণ সূত্রে সুভদ্র ভিক্ষুর অসৎ আচরণের উল্লেখ আছে। কিন্তু এ ঘটনার পরপরই মহাকাশ্যপ মহাসংগীতি আহ্বানের প্রস্তাব দেননি। প্রায় দুই তিন মাস পর মহাকাশ্যপ সংগীতি আহ্বানের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এ সময় তিনি কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, এখন থেকে আমরা যদি সাবধান না হই, তবে সুভদ্রের সংখ্যা ক্রমশই বাড়বে।

এতে বোঝা যায় সুভদ্র দৃষ্টান্ত মাত্র। কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হয় মহাকাশ্যপ খুব গুরুত্ব সহকারে এই মহাসংগীতি আহ্বানের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ভিক্ষু এর গুরুত্ব অনুধাবন করে এই মহাসংগীতি আহ্বানে সম্মত হন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে প্রথম মহাসংগীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। প্রথম মহাসংগীতির পর আরও পাঁচটি সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় সংগীতি অনুষ্ঠিত হয় তথাগত বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের একশত বছর পর বৈশালীর বালুকারামে। তৃতীয় সংগীতির আয়োজন করেছিলেন সম্রাট অশোক খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় অব্দে পাটলিপুত্র নগরে। সিংহল তথা বর্তমান শ্রীলঙ্কায়, রাজা বট্টগামিণীর রাজত্বকালে চৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ৪৫০ বছর পর চতুর্থ সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংগীতি অনুষ্ঠিত হয় ব্রহ্মদেশে (বর্তমান মায়ানমার)।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১ ও ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

বিকাশ চাকমা বৌদ্ধধর্ম ক্লাসে স্যারের আলোচনা থেকে জানতে পেরেছে যে এ পর্যন্ত ছয়টি মহাসংগীতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি বলেন বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে প্রথম মহাসংগীতি খুবই গুরুত্ব বহন করে। বৌদ্ধধর্মীয় ঐকমত্যের জন্য মহাসংগীতি অপরিহার্য। নিজেদের মাঝে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত অনিয়ম বা শাস্ত্রীয় মতভেদ দেখা দিলে তা সম্মেলন বা সমাবেশের মাধ্যমে নিরসন করা যায়।

১. প্রথম মহাসংগীতির তাৎপর্যপূর্ণতার কারণ হল-
 - ক. শুধুমাত্র সুভদ্র ভিক্ষুর অসৎ আচরণ
 - খ. মহামতি বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ
 - গ. মহাকাশ্যপ স্থবিরের অনুপস্থিতি
 - ঘ. সূত্র ও বিনয়ের উপদেশের ভিত্তিতে ধর্মীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা
২. তোমার এলাকায় একাধিক বৌদ্ধ বিহারে যদি ধর্মীয় কোনো বিষয়ে মতদ্বৈধতা দেখা যায় তবে সেক্ষেত্রে করণীয় হল-
 - i. অপব্যখ্যা দানকারীকে শাসি দেওয়া
 - ii. আদালতের মাধ্যমে বিরোধ মিটানো
 - iii. বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নিয়ে সম্মেলন ডেকে ঐকমত্যে আসা

নিচের কানটি সঠিক?

- | | |
|------------|--------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও iii | ঘ. iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অলক মার্মা কব্জবাজারের রামু উপজেলায় বাস করে। কয়েক বছর আগে এখানকার বিভিন্ন বৌদ্ধ মন্দিরের পালনীয় রীতিনীতি নিয়ে কিছুটা মতদ্বৈধতা দেখা দেয়। পরে বিহার অধ্যক্ষ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নিয়ে স্থানীয়ভাবে সম্মেলন করে সূত্র ও পিটকের বিধান মতে ঐকমত্যে আসেন। এ সম্মেলনে বিহার অধ্যক্ষ প্রথম মহাসংগীতিসহ ছয়টি মহাসংগীতির তাৎপর্য তুলে ধরেন।
 - ক. সংগীতি কাকে বলে?
 - খ. প্রথম মহাসংগীতি কেন করা হয়েছিল?
 - গ. তোমার এলাকায় নিজেদের মাঝে কোনো ধর্মীয় বিরোধ বা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হলে কী করা উচিত? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
 - ঘ. প্রথম মহাসংগীতির তাৎপর্য বর্ণনা কর।
২. অশ্রু বড়ুয়া বৌদ্ধধর্ম বই থেকে জানতে পেরেছে প্রথম বৌদ্ধ মহাসংগীতিকে পঞ্চাশতিকা সংগীতিও বলা হয়। যদিও এ সংগীতির জন্য সুভদ্র ভিক্ষুর অবিনীত আচরণ একটি কারণ তবে একমাত্র কারণ নহে। পরবর্তীতে আরও পাঁচটি মহাসংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধধর্মের কোনো বিষয়ে মতদ্বৈধতা দেখা দিলে এ ধরনের মহাসংগীতির প্রয়োজন দেখা দেয়।

- ক. কোথায় প্রথম মহাসংগীতি অনুষ্ঠিত হয়?
- খ. এ মহাসংগীতির আহ্বানের পিছনে সুভদ্র ভিক্ষুর অবিনীত আচরণ ব্যতীত অন্য একটি কারণ ব্যাখ্যা কর।
- গ. কোন অবস্থায় তুমি একটি সম্মেলন আহ্বান করতে পার তা বর্ণনা কর।
- ঘ. মহাসংগীতির অপরিহার্যতা সম্পর্কে তোমার মতামত লিখ।
৩. প্রথম মহাসংগীতির শুরুর পূর্ব মুহূর্তে স্থবির আনন্দ অর্হত্ত্ব ফল লাভ করেন। উপালি স্থবির বিনয় সম্পর্কে মহাকাশ্যপ স্থবিরের সকল প্রশ্নের উত্তর দান করেন। শ্রুতিধর আনন্দ স্থবির সূত্র পিটকের সকল জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর দেন।
- এভাবে উপস্থিত সকল অর্হৎ ভিক্ষুর ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রথম সংগীতি সমাপ্ত হয়। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে প্রথম মহাসংগীতির গুরুত্ব অপরিসীম।
- ক. প্রথম মহাসংগীতিতে কতজন অর্হৎ অংশ নেন?
- খ. স্থবির আনন্দের অর্হত্ত্ব লাভের ঘটনাটি বর্ণনা কর।
- গ. প্রথম মহাসংগীতির গুরুত্ব ও তাৎপর্য লিখ।
- ঘ. প্রথম মহাসংগীতিতে মহাকাশ্যপ স্থবিরের ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম

প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধধর্ম

বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারকাল সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মৌর্য সম্রাট মহামতি অশোকের রাজত্বকালে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করে। আবার কারো কারো মতে পিটক সাহিত্য বজ্জীশ, বজ্জাপ্তপুত্ত প্রমুখ স্থবিরগণ বঙ্গদেশ তথা বাংলাদেশের অধিবাসী ছিলেন। অতএব, বুদ্ধের সময়েই বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ঘটেছিল। পরবর্তীতে গুপ্ত যুগেও বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে। খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত দীর্ঘ চারশ বছর বাংলার পালবংশীয় বৌদ্ধ রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সমগ্র বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে। এ সময়ে বাংলাদেশের সর্বত্র গড়ে ওঠে বহু বড় বড় বিহার, শিক্ষাকেন্দ্র ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে মহাস্থানগড়ে ভাসুবিহার বিশ্ববিখ্যাত। এদিকে কুমিল্লায় খড়্গ ও দেববংশীয় রাজারাও বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁরাও বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এ অঞ্চলের ময়নামতি বিহার বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল। খ্রিষ্টীয় নবম শতকে চট্টগ্রামের পণ্ডিত বিহারের সুনাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৪৬ খ্রিষ্টাব্দে চন্দ্রসূর্য নামে মগধদেশীয় জনৈক সামন্ত যুবক বহু অনুচরসহ চট্টগ্রামে আগমন করেন এবং চট্টগ্রাম ও আরাকানের সমন্বয়ে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বংশের ২৫ জন রাজা দীর্ঘ ৬২৫ বছর রাজত্ব করেছিলেন বলে জ্ঞাত হওয়া যায়। রাজা চন্দ্রসূর্য ও তাঁর বংশধরগণ বৌদ্ধ ছিলেন। চন্দ্রসূর্য চট্টগ্রাম ও আরাকানে বহু বুদ্ধমন্দির, বিহার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আরাকানে ‘মহামুনি’ প্রতিষ্ঠা তাঁর অমর কীর্তি। এরপরও খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত আরাকানি রাজারা বিচ্ছিন্ন বা অবিচ্ছিন্নভাবে চট্টগ্রাম শাসন করেন। সুতরাং, বলা যায়, চট্টগ্রামসহ সমগ্র বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রাচীনকালে প্রচারিত হয়েছিল।

খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে ভারতবর্ষব্যাপী বৌদ্ধধর্মের ওপর নেমে আসে চরম বিপর্যয়। এ সময় মগধসহ বিভিন্ন অঞ্চলের বৌদ্ধগণ আত্মরক্ষা করার জন্য ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হয়। কিছু সংখ্যক নিষ্ঠাবান বৌদ্ধধর্ম রক্ষার মানসে আসাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করে সেখানকার আদি বৌদ্ধদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বসবাস করতে থাকে। আসামে অবস্থানকারী বৌদ্ধরা হিন্দুধর্মের সঙ্গে মিশে যায়। কুমিল্লা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের মধ্যেও অনেকে নানা কারণে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হয়। অল্প সংখ্যক মাত্র বৌদ্ধ নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। এসব অঞ্চলে বর্তমানে বসবাসরত বৌদ্ধরা সেই আদি বৌদ্ধ ও মগধাগত বৌদ্ধদের সম্মিলিত জনগোষ্ঠী। বর্তমানে তারা ‘বড়ুয়া’ বৌদ্ধ নামে পরিচিত। কুমিল্লা অঞ্চলে ‘সিংহ’ ও নোয়াখালীতে ‘চৌধুরী’ পদবিধারীরাও বড়ুয়াবৌদ্ধ।

অষ্টাদশ শতকে বৌদ্ধধর্ম

বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরাকান বৌদ্ধ রাজার অধীনে ছিল। কিছু অংশ চাকমা রাজাদের অধীনে ছিল। চাকমারা ‘চম্পক নগর’ থেকে চট্টগ্রামে এসেছে বলে দাবি করে। এই চম্পক নগর কুমিল্লার কাছাকাছি কোথাও ছিল বলে মনে করা হয়। ১৭৩৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৭৫৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে চাকমাদের রাজা ছিলেন শেরমুস্ত খান। তিনি মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করেন। তাঁর আমলে চাকমা রাজ্যের সীমান্ত ছিল উত্তরে লুসাই পাহাড়, দক্ষিণে ঢাকা ট্রাংক রোড, পূর্বে শঙ্খ নদী ও পশ্চিমে ফেনী নদী। চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে সিরাজদ্দৌলার পরাজয় ঘটে। ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চট্টগ্রামের শাসনভার পায়। চাকমা রাজা মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করলেও ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করলেন না। ফলে চাকমা রাজার সাথে ইংরেজদের প্রায়ই যুদ্ধ হত।

বহু শতাব্দী থেকে মারমা সম্প্রদায়ের লোকেরা রামু ও মাতামুহুরী অঞ্চলে বাস করতে শুরু করে। তারপর তারা বান্দরবান শহরে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এদিকে চাকমারাও নানা কারণে বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে চলে যেতে থাকে। আনুমানিক ১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দে চাকমা রাজা তাঁর রাজ্যের রাজধানী রাজশুনীয়ার রাজানগরে নিয়ে যান। রাজানগরের রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। তার আগে চাকমা রাজার রাজধানী সাতকানিয়া বা রামুর কাছাকাছি কোথাও ছিল বলে মনে করা হয়। বান্দরবান জেলার রামু থানাতে এখনও ‘চাকমা কুল’ নামে একটি স্থান আছে। বর্তমান সাতকানিয়া নামটি ‘সাক কন্যা’ (চাকমা রাজকন্যা) শব্দ দুটি থেকে এসেছে বলে মনে করা হয়। চাকমারা ঐ স্থানকে হাঙর কুল বলত। বোয়ালখালী থানার শাকপুরার আসল নাম ‘চাকমা পুর’ ছিল বলে মনে করা হয়। প্রায় একই সময়ে আরাকান থেকে রাখাইন বৌদ্ধরা পটুয়াখালী জেলায় এসে বসবাস শুরু করে। কিন্তু বড়ুয়ারা আর কোথাও গেল না। চট্টগ্রামেই তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগল।

তখনকার দিনে বৌদ্ধরা ছিল প্রধানত কৃষিজীবী। ব্রিটিশ আমলে বড়ুয়া বৌদ্ধরা নানা চাকরি গ্রহণ করে। সেই চাকরি সম্বন্ধীয় উপাধিগুলো হল চৌধুরী, মুৎসুদ্দী, তালুকদার ইত্যাদি। এখনও চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের মধ্যে সেই উপাধিগুলো আছে। এসময় থেকে চট্টগ্রামের বৌদ্ধরা শিক্ষাদীক্ষায় উন্নতি লাভ করতে থাকে। চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চল ছাড়াও উত্তর বঙ্গে কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ ছিল। এরা রাজশাহী, রংপুর অঞ্চলের নির্দিষ্ট কয়েকটি এলাকায় বাস করত। এদের মধ্যে রাজবংশীদের অনেকেই বৌদ্ধ ছিল। সম্ভবত ঢাকায় কিছু আরাকানি বৌদ্ধ বসবাস করত। ঢাকার মগবাজার নাম তার দৃষ্টান্ত। এছাড়া ঢাকার ধামরাই স্থানের নাম ‘ধর্মরাজিক’ শব্দ থেকে এসেছে। বৌদ্ধ আমলে সাতারের নাম ছিল ‘সাহোর’।

উনবিংশ ও বিংশ শতকে বৌদ্ধধর্ম

১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে চাকমা রাজা জ্ঞানবজ্র খান পরলোকগমন করেন। তিনি সারা জীবন ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গেছেন। ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে ধরম বজ্র খানের পত্নী রানী কালিন্দী রাজত্ব শুরু করেন। ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজরা তাঁকে সরকারিভাবে ‘রানী’ স্বীকার করে নেন। ১৮৬০ সালে চট্টগ্রাম জেলার পূর্ব দিকের পার্বত্য এলাকা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা গঠিত হয়। ১৮০৪ খ্রিষ্টাব্দে বান্দরবানে বোমাং রাজা রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মারমাদের রাজা।

পালবংশের সময়ে বৌদ্ধদের মধ্যে তন্ত্রযান ও মন্ত্রযান ইত্যাদি অনুপ্রবেশ করে। বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরসহ বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ফলশ্রুতিতে পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধধর্মে হিন্দু ধর্মের কিছু প্রভাব পড়ে। তখন বৌদ্ধরাও দুর্গাপূজা, মনসাপূজা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী পূজা, শীতলা পূজা, কার্তিক ব্রত ইত্যাদির প্রচলন শুরু করে এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও ধর্ম-বিনয় শিক্ষার অভাব সর্বোপরি ত্রিপিটকের পুস্তকাদির অভাবে প্রকৃত থেরবাদ ধারা থেকে কিছুটা বিচ্যুত হয়ে নানা পূজা-পার্বণ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এ সময় ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে বার্মার প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষু সঞ্জরাজ সারমেধ মহাস্থবির চট্টগ্রামে আসেন।

এ সময় চৈত্র মাসে সঞ্জরাজ সারমেধ তাঁর শিষ্যদের নিয়ে সীতাকুণ্ডে উপস্থিত হন। সেখানে রাধারাম মাথে (মহাস্থবির) তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। সীতাকুণ্ড থেকে পরে তাঁরা পাহাড়তলী মহামুনিতে আসেন। মহামুনি তখন বৌদ্ধদের প্রসিদ্ধ স্থান। প্রতিবছর এখানে চৈত্রসংক্রান্তিতে এক সপ্তাহ ধরে মেলা বসত। এই মেলায় মারমা, চাকমা ও বড়ুয়া বৌদ্ধরা অংশ নিত। এটি ছিল বৌদ্ধদের জন্য বার্ষিক মিলনকেন্দ্র। এই মেলাটি পরে এক সময় এক মাস ধরে চলত।

সঞ্জরাজ সারমেধ এখানে প্রায় দুই বছর ছিলেন। এসময় তিনি চাকমা ও বড়ুয়া সমাজের বিভিন্ন স্থানে গমন করেন। তিনি বৌদ্ধধর্মে তন্ত্রমন্ত্র, পশুবলি ও দেবদেবীর পূজার বিরুদ্ধে মত প্রচার করেন। বৌদ্ধরা তখন আবার বিনয়সম্মতভাবে ধর্ম পালন শুরু করে। এতে চাকমা, মারমা ও বড়ুয়া সমাজে নবজাগরণ শুরু হয়।

চাকমা রানী কালিন্দী সঞ্জরাজকে রাজানগর রাজবাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন। সঞ্জরাজের কাছে তিনি থেরবাদ বৌদ্ধধর্মে নতুন করে দীক্ষা নেন।



চাকমা



বড়ুয়া



মারমা

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পুণ্যাহ উপলক্ষে রানী তাঁকে রাজকীয় উপাধিতে ভূষিত করেন। তারপর সঞ্জরাজ সারমেধ আরাكانে চলে যান। ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে সঞ্জরাজ সারমেধ আবার একদল ভিক্ষু সঙ্ঘসহ চট্টগ্রামে আসেন। এবারও তিনি ভিক্ষুদের মধ্যে থেরবাদ প্রচার করেন। তিনি এক বছর চট্টগ্রামে অবস্থান করে আবার বার্মায় ফিরে যান। এ সময় থেকে চট্টগ্রামের ভিক্ষুসঙ্ঘ প্রধান দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি ‘সঞ্জরাজ দলের ভিক্ষুসঙ্ঘ’ ও অন্যটি ‘মহাস্থবির দলের ভিক্ষুসঙ্ঘ’। সেই সাথে বৌদ্ধ জনসাধারণও দুই দল বা নিকায়ে বিভক্ত হয়। সেই নিকায় বিভাগ এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের বৌদ্ধদের মধ্যে আছে।

এই দুই নিকায়ের ভিক্ষুদের মধ্যে নীতিগত কিছু পার্থক্য থাকলেও গৃহীদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই। দুই দলের গৃহীরা বৈবাহিক ও সামাজিক সব অনুষ্ঠান একত্রে পালন করে থাকে।

সঞ্জরাজ সারমেধ ছাড়াও বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে অনেক গৃহী বৌদ্ধ ও বৌদ্ধ ভিক্ষু অবদান রাখেন। তাঁদের মধ্যে পূর্ণচার মহাস্থবির, তিতন মহাস্থবির, রামধন মহাস্থবির, ধর্মবংশ মহাস্থবির, কৃপাশরণ মহাস্থবির, ভগবান মহাস্থবির, উ জবনাতিষ্য মহাথের, ধর্মানন্দ মহাস্থবির, বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির, প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির, প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির, অভয়তিষ্য মহাস্থবির শীলালংকার মহাস্থবির, বিশুদ্ধানন্দ মহাথের প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

রাজা রানীদের মধ্যে রানী কালিন্দী, রাজা ভুবনমোহন রায়, মানিকছড়ির রাজা এবং বান্দরবানের রাজা অং শোয়ে ফু প্রসিদ্ধ।

বৌদ্ধ গৃহীদের মধ্যে নাজির কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী, ডাক্তার ভগীরথ বড়ুয়া, আইনবিদ উমেশ চন্দ্র মুৎসুদী, ড. বেণীমাধব বড়ুয়া, বীরেন্দ্র লাল মুৎসুদী, পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বড়ুয়া, শিক্ষাবিদ মোহনচন্দ্র বড়ুয়া, অধ্যক্ষ প্রমোদ রঞ্জন বড়ুয়া, ড. রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়ার নাম উল্লেখযোগ্য। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে বার্মা ও কলিকাতা থেকে ত্রিপিটক ও অন্যান্য বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ হয়ে বাংলাদেশে আসতে শুরু করে। এতে বৌদ্ধদের মধ্যে ধর্মীয় জাগরণ আরও দ্রুত হয়।

১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে ‘চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতি’ (বর্তমানে বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি) প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধদের প্রাচীন ও বড় প্রতিষ্ঠান। ‘বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষি প্রচার সঙ্ঘ’ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫০ সালে। এছাড়া আরও

অনেক বৌদ্ধ সংগঠন আছে। সেগুলোর মধ্যে পার্বত্য বৌদ্ধ সঙ্ঘ, বাংলাদেশ সঙ্ঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা, বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভা, পার্বত্য ভিক্ষু সমিতি, রাখাইন মারমা সঙ্ঘ কাউন্সিল, বাংলাদেশ বৌদ্ধ যুব পরিষদ, বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন, বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট স্কলার্স ফোরাম, বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ পালি সাহিত্য সমিতি, অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশে বৌদ্ধ বিহারের সংখ্যা প্রায় এক হাজার। এগুলোর মধ্যে পাহাড়তলী মহামুনি বিহার, কক্সবাজারের অগ্গমেধা বিহার, রাউজানের সুদর্শন বিহার, রামুর রামকোট বিহার, রাজানগর রাজবিহার ইত্যাদি অন্যতম প্রাচীন বিহার। চিংমরম বিহার, সীতাকুন্ড বিহার, পাহাড়তলী মহামুনি মন্দির, রাজানগর রাজবিহার, ঠেগরপুনি বিহার, রাজ্যামাটি রাজবিহার বৌদ্ধদের প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র।

প্রতি বছর বৌদ্ধধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে যে সব মেলা হয় তার মধ্যে মহামুনি মেলা, চক্রশালা, মেলা, সাতবাড়িয়া বেপারিপাড়া মহামুনির মেলা, ঠেগরপুনি মেলা, মানিকপুর পরিনির্বাণ মেলা, চৈদির পুণি ও মহাদিয়ায় চৈত্য মেলা, রামকোট মেলা, ঢেমসা শাক্যমুনি মেলা, বাগোয়ান ফরাচিং মেলা, বীনাঙ্গুরি পরিনির্বাণ মেলা, ইছামতি ধাতুচৈত্য মেলা, লাঠিছড়ি বুদ্ধমেলা, শীলঘাটা পরিনির্বাণ মেলা, আব্দুল্লাপুর শাক্যমুনি মেলা প্রসিদ্ধ। ঢাকায় প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিহার কমলাপুর ধর্মারাজিক মহাবিহার ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া মেরুল বাড়ডায় আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার এবং মিরপুরে শাক্যমুনি বিহার আছে। চট্টগ্রাম শহরে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার, নবপণ্ডিত বিহার, পূর্ণাচার আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারসহ দশটি বিহার রয়েছে।

বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে বাংলাদেশে কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এগুলোর মধ্যে বৌদ্ধ কৃষি প্রচার সঙ্ঘের মুখপত্রের নাম ‘কৃষি’। পালি বুক সোসাইটির পত্রিকা ‘জ্যোতি’, অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর ‘অনোমা’ ইত্যাদি।

বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান বুদ্ধ পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, মধু পূর্ণিমা, প্রবারণা পূর্ণিমা, কঠিন চীবর দান, মাঘী পূর্ণিমা, ফালগুণী পূর্ণিমা ইত্যাদি। এ ছাড়া চাকমা ও বড়ুয়াদের প্রধান সামাজিক উৎসব বিজু বা বিউ পরব। বাংলা বছরের শেষ দুই দিন ও নববর্ষের প্রথম দিনসহ পাঁচ দিন এই উৎসব চলে। এ সময় বিভিন্ন জায়গায় মেলা অনুষ্ঠিত হয়। তার মধ্যে পাহাড়তলী মহামুনি এবং রাজানগর মহামুনি ও রাঙামাটির মেলা প্রসিদ্ধ।

বৌদ্ধদের কল্যাণের জন্য সরকার ‘বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট’ গঠন করেছে। এই ট্রাস্ট গঠিত হয় ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে। এর উদ্দেশ্য বৌদ্ধ ধর্মীয় স্থানগুলো সংরক্ষণ ও মেরামতের জন্য অর্থসাহায্য প্রদান। এছাড়া বৌদ্ধ ছাত্রছাত্রীদের জন্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ মূলত পালি ভাষায় লেখা। বাংলাদেশ সরকার এ জন্য ‘পালি ও বোর্ড’ প্রতিষ্ঠা করেছে। এই বোর্ডের অধীনে প্রায় তিরিশটি পালি টোল আছে। এ ছাড়াও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম কলেজে পালি বিষয়ে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে এবং রাঙামাটি সরকারি কলেজসহ বিভিন্ন বেসরকারি কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি পর্যায়ে পালি ভাষার শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে।

বাংলাদেশে বৌদ্ধদের সংখ্যা ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের আদমশুমারি অনুযায়ী ৬,২৩,০০০ জন। এতে দেখা যায় চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কক্সবাজার, পটুয়াখালী, ঢাকা, কুমিল্লা, সিলেট, রংপুর ও রাজশাহীতে বৌদ্ধরা বাস করে। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রামণের সংখ্যা আনুমানিক ২ হাজার।

বৌদ্ধদের প্রধান জীবিকা কৃষি। এছাড়া বৌদ্ধরা সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করে। ব্যবসা-বাণিজ্যেও বৌদ্ধরা নিয়োজিত আছে। ১৯৯৪ সালের আদমশুমারিতে ঢাকার বৌদ্ধদের সংখ্যা ৬,৩৫৭ জন বলে জানা যায়।

এখানে আমরা বাংলাদেশে বৌদ্ধদের অবস্থা ও ইতিহাস সম্পর্কে কিছু জানলাম। সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাস প্রত্যেকেরই জানা দরকার। ধর্মীয় ইতিহাস জানা থাকলে ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান বাড়ে এবং আগ্রহ সৃষ্টি হয়। নানা কারণে ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আমরা তেমন সচেতন নই। দেশ ও জাতির উন্নতির জন্য ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার। যারা নিজের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান তারা পরের ধর্মকেও শ্রদ্ধা করেন। সচেতনভাবে ধর্ম পালনের জন্য নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার।

অনুশীলনী

১. আরাকান থেকে রাখাইন বৌদ্ধরা বাংলাদেশের কোন জেলায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে?
ক. পটুয়াখালী খ. নোয়াখালী
গ. বাঁশখালী ঘ. রাঙামাটি
২. বৌদ্ধ আমলে সাভারের প্রাচীন নাম হল-
ক. সাহেত-মাহেত খ. সাহোর
গ. রাজানগর ঘ. সাতকানিয়া
৩. চট্টগ্রামের বৌদ্ধরা কয়েকটি দলে বিভক্ত আছে। যদিও তাদের মধ্যে মৌলিক বিষয়ে মিল রয়েছে। দলের সংখ্যা হল-
ক. দুইটি খ. তিনটি
গ. চারটি ঘ. পাঁচটি
৪. বাংলাদেশে বৌদ্ধ বিহারের সংখ্যা প্রায়-
ক. আটশত খ. নয়শত
গ. এক হাজার ঘ. দুই হাজার

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

সম্ম্যাকালীন বন্দনার সময় ঢাকা কমলাপুর ধর্ম রাজিক বিহারের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শুদ্ধানন্দ মহাস্থবির বন্দনার উদ্দেশ্যে আগত দায়ক দায়িকাগণকে ধর্মদেশনা করছিলেন। তিনি বাংলাদেশে অষ্টাদশ, উনবিংশ, বিংশ শতকের বৌদ্ধধর্মের ওপর আলোচনা করেন। তাতে চাকমা রাজার সাথে ইংরেজদের সম্পর্কের স্বরূপ এবং তৎকালীন বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণের বিষয়ও তুলে ধরেন।

৫. চাকমা রাজার সাথে ইংরেজদের প্রায়ই যুদ্ধ হওয়ার কারণ কী ছিল?
ক. চাকমা রাজার ইংরেজ রাজ্য অধিকারের লোভ
খ. চাকমা রাজার ইংরেজ রাজের প্রতি পূর্ব শত্রুতা
গ. চাকমা রাজার ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার না করা
ঘ. চাকমা রাজ্যে ইংরেজি ভাষাকে প্রাধান্য না দেওয়া
৬. বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণ করা যায়:
i. বিহার প্রতিষ্ঠা ও বৌদ্ধধর্ম প্রচার করে
ii. বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মাঝে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে
iii. দেশ বিদেশ ও তীর্থসমূহ ভ্রমণ করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-----------|------------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. i, ii এবং iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস সুপ্রাচীন। ধারণা করা হয় বুদ্ধের সময় হতেই এদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রসার লাভ করে। পালবংশের সময়ে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটলেও বৌদ্ধদের মধ্যে হিন্দুধর্মের কিছু প্রভাব পড়ে। এ সময় সঞ্জরাজ সারমেধ মহাস্থবির পার্বত্য অঞ্চলে শিষ্যদের নিয়ে প্রায় দুই বছর অবস্থান করে চাকমা, মারমা ও বড়ুয়া সমাজে বিনয়সম্মত ভাবে ধর্ম পালনের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। অতএব বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ধর্ম প্রচারের ভূমিকা অনন্য।

- ক. পাল বংশীয় বৌদ্ধ রাজাদের শাসনকাল কত বছরের?
- খ. পাল বংশের সময়ে বৌদ্ধদের ওপর হিন্দু ধর্মের প্রভাব সংক্ষেপে লিখ।
- গ. বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ভূমিকা অন্যতম ছিল। সংক্ষেপে আলোচনা কর।
- ঘ. সম্ভরাজ সারমেধ মহাস্থবিরের ভূমিকা মূল্যায়ন কর।
২. চন্দ্রসূর্য বংশের রাজাগণ প্রায় ৬২৫ বছর চট্টগ্রাম ও আরাকানের সমন্বয়ে গঠিত রাজ্যে রাজত্ব করেন। মহামুনি বিহারসহ অনেক বিহার ও বৌদ্ধমন্দির এ সময়ে নির্মিত হয়। এ থেকে অনুমান করা হয় এদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রাচীন কালেই প্রচারিত হয়েছিল। ত্রয়োদশ শতক ছিল বৌদ্ধধর্মের ওপর বিপর্যয়ের সময়। সকল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর নিজ ধর্মের ইতিহাস জানা অবশ্য কর্তব্য।
- ক. চন্দ্রসূর্য কোন দেশীয় ছিলেন?
- খ. তাঁর রাজত্বকাল সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
- গ. নিজ ধর্মের ইতিহাসের শিক্ষাকে তুমি কীভাবে কাজে লাগাবে?
- ঘ. ‘ত্রয়োদশ শতক ছিল বৌদ্ধধর্মের ওপর বিপর্যয়ের সময়’-এ সম্পর্কে তোমার মতামত লিখ।
৩. উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে চট্টগ্রামের ভিক্ষুসঙ্ঘ দুই দলে বিভক্ত। তবে এ ব্যাপারে গৃহীদের মধ্যে কোনো সমস্যা নেই। এ সময় অনেক বৌদ্ধ গৃহীও বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে অবদান রাখেন। এছাড়া বাংলায় অনুদিত বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থসমূহও বৌদ্ধ ধর্মীয় জাগরণে ভূমিকা রাখে। সরকার বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, পালি ও সংস্কৃত বোর্ড, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পালি শিক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে বৌদ্ধদের কল্যাণ করে যাচ্ছে।
- ক. চট্টগ্রামের ভিক্ষুসঙ্ঘের বিভক্ত দল দুইটির নাম লেখ।
- খ. দুই দলের গৃহীদের জীবনাচরণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
- গ. উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশে বৌদ্ধদের মাঝে যে পুনর্জাগরণ দেখা যায় তা বর্ণনা কর।
- ঘ. বৌদ্ধদের কল্যাণে সরকারের গৃহীত ব্যবস্থার উন্নয়নে তোমার মতামত লেখ।